আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
এবং হিউম্যানিস্টস্
অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র
Vol. - 7 Issue - 3
স্বাধীনতা সংখ্যা ২০০৮

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন

সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল

মূল্য : পনের টাকা

উপদেষ্টা : প্রবীর ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : ২৫৫৯-০৪৩৫

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
পি ২, ব্লক বি, লেকটাউন কলকাতা-৮৯
ফোন : ২৫২১-৬২৭০

সূচি

সম্পাদকীয়/২

বিশেষ প্রবন্ধ :
দার্জিলিং ও গোর্খাল্যান্ড : যুক্তিবাদী/৩
গোর্খাল্যান্ডের দাবী : কী ও কেন :
মনোজ গিরি/১০
গোর্খাল্যান্ডের দাবী : কয়েকটি ভাবনা :
বুদ্ধপ্রভ বাগ/১৪

আইন :
রাষ্ট্রীয় 'আইনি' সন্ত্রাস :
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য/১৯

স্মৃতিচারণ :
ভন্ডামীর জগতে বরুণ সেনগুপ্ত ব্যতিক্রমী :
প্রবীর ঘোষ/২৪

ফিচার :
নেতা হতে হলে... : মনসী মল্লিক/২৬
মানসিক চাপ কমাতে... : খুশবন্ত সিং/২৯

প্রবন্ধ :
'যুক্তি-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ' এবং... :
সুতীর্থ সিংহ/৩১
নৈরাশ্য একটি সামাজিক ব্যাধি :
মানসী মল্লিক/৩৩

রিপোর্ট
যৌন প্রতারণা ও এক স্বামীজী :
সন্তোষ শর্মা/৩৬

চিঠিপত্র : /৪০

সম্পাদকীয়

এ'দেশের ইতিহাস জানার স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার

ইতিহাস যা বলে

✶ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের (Commonwelth) স্বশাসিত উপনিবেশ (Dominion) হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

✶ ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল বা ১ নং প্রশাসক পদে বসলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। তিনিই হলেন এ'দেশের সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তা।

✶ ১৯৪৮-এর ২১ জুন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে বসেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন দেশে ফিরবেন, তাই এই পরিবর্তন। কিন্তু রাজা গোপালাচারি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি শপথে বলেছিলেন—

"আমি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি মহারাজ ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতি আইনানুসারে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব। এবং আমি গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থেকে মহারাজ ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের সুষ্ঠ ও যথাযথভাবে সেবা করব।"

একটু ভাবুন

✶ আজ যারা দড়ি টেনে 'স্বাধীনতা দিবসে' পতাকা তোলে, লালবাতি জ্বেলে পুলিশ পাহারায় হু-স্ করে চলে যায় তাদের প্রায় সকলেরই স্থান হওয়া উচিত ছিল গারদ-ঘরে। দুর্নীতিবাজ, যৌন উচ্ছৃঙ্খল, খুনী, সন্ত্রাসবাদী এইসব নেতারাই ঠিক করে কে বেশি চামচা, কাকে দেবো পদ্মশ্রী, কাকে দেবো পদ্মবিভূষণ। আর 'ভারতরত্ন'? এটা তোলা থাকে রাজনীতির সুপার মস্তানদের জন্য।

এদের সেলাম না জানিয়ে ঘৃণা ছুঁড়ে দিল। ২০০৭ নবজাগরণবর্ষ থেকে চাকা ঘুরছে। সুদিন আসছে।

দার্জিলিং ও গোর্খাল্যান্ড

যুক্তিবাদী

গত জুনে কলকাতার বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে দার্জিলিং নিয়ে গাদা আলোচনা আমরা দেখেছি-শুনেছি। লেখক, গায়ক, ভিলেন, অভিনেতা, অভিনেত্রী, রাজনীতিক, মন্ত্রী ইত্যাদি 'সেলিব্রিটি'-দের আলোচনায় অবাক হয়েছি। এরই মাঝে এক-আধজন 'গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন'-এর নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ এসেছেন বটে, কিন্তু চ্যানেলগুলো বাঙালি ভিউয়ারদের মন পেতে ওইসব গোর্খা-নেতাদের কথা ছেঁটে, ডানা ছেঁটে হাসজারু করে ছেড়েছে। বিপ্লব থেকে চূর্ণি প্রত্যেকেই দারুণ সব যুক্তি হাজির করলেন। এঁরা কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে, কেউ মিনমিন করে জানালেন, দার্জিলিংকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবেন না। দেশকে টুকরো করার এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাকে কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সরকারি কবি নানা ভাষার জট পাকিয়ে কিছু গোলাগোলা কথা বললেন, যার মোদ্দা অর্থ নিশ্চয়ই সিপিএম সরকারের 'স্ট্যান্ড পয়েন্ট'-কে সমর্থন জানানো।

প্রত্যেকের কথাতেই একটা সুর স্পষ্ট—কোনওভাবেই দেশটাকে আর টুকরো করতে দেওয়া হবে না। চ্যানেলের সঞ্চালকদের কথাতেও একই সুর।

কটা কথা মাথায় ঢুকলো না—গোর্খারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলো কবে? আলাদা দেশ গড়ার দাবি এখনকার গোর্খা জনগোষ্ঠীরা তোলেননি। বিমল গুরুং-এর নেতৃত্বে যে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন করা হচ্ছে তা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবিতে কোনও আন্দোলন নয়। পৃথক স্বাধীন দেশ গড়ার দাবিতে কোনও আন্দোলন নয়। পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন।

পৃথক রাজ্যের দাবিকে স্বীকার করে সংবিধান

পৃথক রাজ্যের দাবিকে ভারতীয় সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ধারা মেনেই অসম ভেঙে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল হয়েছে। পাঞ্জাব ভেঙে হয়েছে হরিয়ানা ও হিমাচলপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাঞ্চল রাজ্য হয়েছে, মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড়, বিহার ভেঙে ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র ভেঙে হয়েছে গুজরাট।

কোনও রাজ্যের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ পৃথক রাজ্যের দাবি তুললে দেখা প্রয়োজন সেই অঞ্চলের মানুষের ভাষা সংস্কৃতি মূল রাজ্যটি থেকে পৃথক কিনা?

পৃথক হলে তারা গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র বা জাতিস্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পৃথক রাজ্যের দাবি করতেই পারে। কোনও জাতি গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠী যদি নিজেদের সংস্কৃতি ও জাতিসত্ত্বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারে, অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই জনগোষ্ঠী স্পষ্টতই পরাধীন। গণতন্ত্রের চালু সংজ্ঞা হল—যে সরকার জনগণের মধ্য থেকে প্রতিনিধি বেছে নেয় এবং জনগণের জন্য কাজ করে। কোনও জনগোষ্ঠী যদি দেখে তাদের সংস্কৃতি, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাপে পদে পদে খর্বিত হচ্ছে, তাদের জাতিস্বাতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে, তবে তার কাছে এমন গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য।

'স্বরাজ' যদি হয় মানুষের জন্মগত অধিকার, তবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সম্পন্ন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার হতে বাধ্য।

স্বাধীন 'গোর্খাস্তান'-এর দাবি উঠেছিল ষাট বছর আগে

মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বিভিন্ন চ্যানেলে দেওয়া ইন্টারভিউতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, আজ গোর্খাল্যান্ডের দাবি মানলে তারপর তো প্রত্যেকটা জেলা, প্রত্যেকটা মিউনিসিপ্যালিটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি তুলবে। দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সঞ্চালকরা হাসি হাসি মুখে অশোকবাবুর কথা শুনেছেন, কোনও প্রশ্ন তোলেননি। কেন তোলেননি? অজ্ঞতা থেকে? নাকি অশোকবাবুকে সন্তুষ্ট করে ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে সুবিধে নেবার আশায়?

একজন সঞ্চালক যখন দার্জিলিং নিয়ে একটি অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব নিচ্ছেন, তখন দার্জিলিং নিয়ে একটু পড়াশুনা—একটু হোমওয়ার্ক কেন করে নিলেন না? কেন তিনি প্রশ্ন তুলেন না, প্রায় ষাট বছর আগে স্বাধীন 'গোর্খাস্তান'-এর দাবি তুলেছিল অশোকবাবুরই পার্টি। তখন সিপিএম-এর জন্ম হয়নি। নাম ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তখন বিধায়ক হিসেবে জ্যোতি বসু ছিলেন। দার্জিলিং-এর বিধায়ক ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির রতনলাল ব্রাহ্মণ।

কমিউনিস্ট পার্টি তখন জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে পাকিস্তান, গোর্খাস্তান ও হিন্দুস্তান এই তিন বিভাজনের পক্ষে সোচ্চার ছিল। ১৯৪৬ থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি দাবি তুলেছিল—দার্জিলিং, নেপাল ও সিকিমকে নিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম 'গোর্খাস্তান' গড়তে হবে।

কেন সঞ্চালক অশোকবাবুকে প্রশ্ন করলেন না—**সেদিন আপনার পার্টি স্বাধীন সার্বভৌম গোর্খাস্তান-এর পক্ষে দাবি জানিয়েছিলেন। আর আজ আপনার পার্টিই গোর্খাল্যান্ডকে প্রদেশের দাবি ছাড়তেও নারাজ। কেন এই অবস্থার পরিবর্তন?** কেন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন? তখন বিরোধী দলে ছিলেন এবং এখন শাসন ক্ষমতায় আছেন বলে? গোর্খা জনগোষ্ঠী অবস্থান পাল্টায়নি। অবস্থান পাল্টেছে আপনার পার্টি। কেন?

সঞ্চালকরা কবে মোসাহেবগিরি ছেড়ে সত্যিকারের সঞ্চালক হয়ে উঠবেন? কবে বিবিসি রেডিওর সঞ্চালকদের দেখে শিখবেন? আন্তর্জাতিক মানে উঠতে চেষ্টা করবেন? যাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, তাঁদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকতেই পারে, থাকবেও। কিন্তু সঞ্চালক তারপরও যদি আসল সত্যকে বের করে আনতে পারেন তবেই তিনি ভাল সঞ্চালক।

এখানকার সঞ্চালকরা হতাশ করেছেন। অশোকবাবুর গোলাগোলা কথা, অসার যুক্তি সবেই সঞ্চালকরা বিগলিত হয়েছেন, এবং পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে মাঝেমাঝেই সম্বোধন করেছেন 'অশোকদা' বলে। গোড়াতেই 'দাদা' সম্বোধন করে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দিয়েছেন।

এক সময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি শ্লোগান তুলেছিল—স্বরাজ মানুষের জন্মগত অধিকার। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্মগত অধিকার।

ইংরেজরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করলো তখন অশোকবাবুর পার্টি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। আজ সেই পার্টিই আঞ্চলিক অখন্ডতার ধুয়ো তুলে গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনকারীদের ভিলেন-পাগল-ছাগল-বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি বানাতে চাইছে।

অশোকবাবু প্রশ্ন তুলেছেন—গোর্খারা দার্জিলিং-এ এলো কবে?

'কবে এলো' এই প্রশ্নে পরে যাবো। কিন্তু যদি পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনারা বাঙালরা পশ্চিমবঙ্গে এলেন কবে?

জ্যোতি বসু থেকে বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে সুভাষ চক্রবর্তী সবাই ওপার বাংলা থেকে এলেন কবে? অশোকবাবু, আপনি ক'পুরুষ আগে এই বঙ্গে এসেছেন?

গৌড়-বঙ্গের আদিবাসী কারা?

বাঙ্গালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে অতুল সুর তাঁর *'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' প্রবন্ধে (বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, ১৯৯৪) লিখছেন, "বাঙালি বলতে আমরা বুঝি যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাংলাদেশে এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক।"... "এ ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল বাংলার আদিম অধিবাসীরা। তারা যে প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"*

"প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকরাই বাংলার প্রকৃত আদিবাসী। তারা যে ভাষায় কথা বলে তাকে 'অস্ট্রিক' ভাষা বলা হয়।"...

"ভারতে এই ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে 'মুণ্ডারি' ভাষা—যে ভাষায় সাঁওতাল, ভীল, কুরুখ, কোরওয়া, জুয়াঙ, কোরফু প্রভৃতি উপজাতিরা কথা বলে।"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'গৌড় বঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—এই তিনটি নাম একত্র পাই, তিনটি বিভিন্ন অনার্য (সম্ভবত কোল-ভাষী) উপজাতির নাম।"

আমরা জানলাম, 'বঙ্গ' একটি অনার্য উপজাতির নাম। সেই অনার্য উপজাতিদের বসতি অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'বঙ্গ'।

বঙ্গের আরও এক মনীষা আহমদ শরীফ। তিনি বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শন প্রথম খণ্ড, ২০০১ প্রবন্ধে লিখেছেন, "ইতিহাসের আলোচনা থেকে এটাই আমাদের শিখতে হবে যে, আমার স্বচ্ছ হওয়া দরকার—আত্মপরিচয় নিয়ে দাঁড়ানো দরকার। বাংলাভাষী রাষ্ট্রসত্ত্বার বিবর্তনের পরিচয় ভৌগোলিক পটভূমির আশ্রয়ে আমাদের বুঝতে হবে—ঐতিহাসিক প্রবণতা ও ইতিহাসের ইঙ্গিত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যদি একথা স্বীকার করার সৎসাহস অর্জন করি যে, আমাদের দেহে শেখ সৈয়দ কোরোশির রক্ত নেই, তুর্কি মোগল পাঠানের রক্তও নেই, আর্যরক্তও নেই—আমরা এই দেশের এই মাটিরই সন্তান, আমরা যদি মানতে পারি যে, আমাদের শতকরা ৭০ ভাগ অস্ট্রিক, পঁচিশ ভাগ মোঙ্গল এবং বাকি পাঁচ ভাগ হাবসি, তুর্কি, মোগল, আফগান, ইরানি ইত্যাদি সংকর রক্ত এবং আমরা যদি উপলব্ধি করি যে, অস্ট্রিক, মোঙ্গল, হাবসি, তুর্কি, মোগল, আফগান, ইরানি সব আজ এক দেহে লীন, এবং আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি যে, আমাদের দেব-দেবী ধর্মচিন্তা, আচার, অনুসন্ধান, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি কোথা থেকে এসেছে এবং এগুলোর উৎস কোথায়, আদি কোথায়, তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব এবং অনেক সমস্যারই সমাধান সহজ হবে। আর্যরক্তের গৌরব করার একটা প্রবণতা সারা ভারত জুড়ে আছে, বাংলার—বাংলাদেশের মুসলমানেরও আছে। যে মুসলমান নিম্নবর্গের হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, সেও গর্বের সঙ্গে পরিচয় দিতে চায় এই বলে যে, ব্রাহ্মণের থেকে কনভার্ট হয়েছিল। যা কিছু ভালো, মহৎ, বড়ো, সবই আর্যের দান—এমন ধারণাও আজও প্রচার করা হয়। আর্য-সভ্যতা বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধারক বলে পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টার আজও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্যের অবদান কী? আর্যরা ঋগ্বেদের কিছু অংশ সম্বল করে পশ্চিমের পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। যেহেতু তারা সংখ্যায় অতি অল্প—সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার তুলনায় আর্য একেবারেই অল্প—কাজেই তারা তাদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ভারতীয় সমাজে রক্ষা করে চলতে পারেনি।

যেমন মোগল, পাঠান, তুর্কি, কেউই ভারতে এসে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি আর্যেরাও পারেনি।"

'অস্ট্রিক' কারা? অভিধান বলছে, নিষাদ, ব্যাধ, চণ্ডাল, ধীবর ইত্যাদি পেশার জাতিগোষ্ঠী। 'মোঙ্গল' বলতে কাদের বোঝায়? অভিধানের কথায়, মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন যাযাবর বনবাসী যোদ্ধা জাতিগোষ্ঠী, মোঙ্গলিয়ার জাতিগোষ্ঠী।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলার আদিবাসী প্রসঙ্গে লিখেছেন, বাঙ্গালায় মানুষদের বাস প্রথমে ছিল না। প্রথমে আসে আফ্রিকা থেকে নিগ্রোজাতীয় মানুষ। আফ্রিকার পরে আসে ভারতে প্রবেশ করা আরব, ইরান ও দক্ষিণ বেলুচিস্থানের কিছু মানুষ। বাংলাদেশেও এদের আগমন হয়। তারপরে আসে নিষাদজাতির মানুষ। যাদের Austric বা Austro Asiatic বলে। এদের ভাষা এখন পরিবর্তিত আকারে কোল, খাসিয়া, নিকোবরিদের ভাষা। এদেরই সাক্ষাৎ বংশধর মুণ্ডারি, সাঁওতালি, হো, কুরকুঁ, গদব, শবরভাষীরা। তারপর আসে দ্রাবিড়ভাষী জাতি। এরা নিষাদের চেয়ে উন্নত ছিল। নাগরিক সভ্যতার পত্তন এরাই করে। তারপরে নাম করতে হয় পূর্বদেশ থেকে আগত কিরাতদের। নাক চ্যাপ্টা, হলদে রং, বেঁটে-খাটো শিকারি মানুষ ছিল এরা। এরা ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর বাঙ্গালায়, পূর্ব বাঙ্গালায় আর আসাম জুড়ে। শেষ দিকে আসে আর্যভাষী জাতির শাখা। **বাঙ্গালার নিষাদ, কিরাত, দ্রাবিড় আর্যজাতির মানুষরা মিশে গিয়ে তৈরি হয় 'বাঙ্গালি' জাতি গোষ্ঠী।** *(বেতার জগৎ, বর্ষ ২২, সংখ্যা ১৬)*।

এরপর কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, বাঙালিরা বাংলায় এলো কবে? কী উত্তর দেবেন অশোকবাবু?

গোর্খারা এলো কোথা থেকে

দার্জিলিং, নেপাল, সিকিম, তরাই, জলপাইগুড়ির পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন পাহাড়ি উপজাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করতো। তারা যেহেতু এক একটি অঞ্চলে যাযাবরের মত ঘুরে ঘুরে চাষ করতো, তাই এরা কেউ একটি অঞ্চলের অধিবাসী ছিল না। এরা এসেছিল তিব্বত, বর্মা, নেপাল, সিকিম, ভুটান ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। এরা ছিল মঙ্গোলিয়দের বহু শাখা-প্রশাখা। এদের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণ ঘটেছিল। এই উপজাতিগোষ্ঠীগুলো সামগ্রিক ভাবে গোর্খা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ইংরেজরা 'গোর্খা' শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯০১ সালের জনগণনায় দেখা যায় দার্জিলিং-এর জনসংখ্যার ৬১ শতাংশ নেপালি বংশোদ্ভুত। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু বাঙালি হিন্দু জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে উদ্বাস্তু হিসেবে চলে আসেন।

দার্জিলিং

দার্জিলিং শব্দটি এসেছে তিব্বতি 'দোর্জে-লিং' শব্দ থেকে। তিব্বতি ভাষায় 'দোর্জে' শব্দের অর্থ 'বজ্র'। 'লিং' শব্দের অর্থ 'স্থান'। দোর্জেলিং বা দার্জিলিং শব্দের অর্থ 'বজ্রের স্থান' বা 'বজ্রের দেশ'।

দার্জিলিং অঞ্চলটি বিভিন্ন সময়ে সিকিম বা নেপালের রাজার অধীনে ছিল। ভারতের অন্যান্য রাজার অধীন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মতোই ছিল দার্জিলিং-এর উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের অবস্থা। রাজাদের সীমান্ত বলতে তারের বেড়া কেন বাঁশের বেড়াও থাকতো না। সাধারণ মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল চাষ। যুদ্ধ বিষয়ে ওদের অভিজ্ঞতা অনেকটা এইরকম—গ্রামের মানুষ, ক্ষেতের মানুষ হঠাৎ দেখতো কিছু মানুষ অস্ত্র নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। কিছুক্ষণ কৌতুহল নিয়ে ওই সেনাদের দেখতো। তারা চলে গেলে আবার যে যার নিজের কাজে মন দিত। কোন্ রাজা কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, জানার চেষ্টাই করতো না। এমনকি নিজের এলাকার রাজার নামও জানতো না। জানার প্রয়োজনই হতো না। দার্জিলিং অঞ্চলের গোর্খা উপজাতি গোষ্ঠীরও প্রয়োজন হতো না।

১৭৮০ সালে নেপালের সঙ্গে সিকিমের যুদ্ধ আবার একদফা শুরু হয়। ৩০ বছর ধরে খুচ্‌খাচ্ যুদ্ধ চলতেই থাকে। সিকিমরাজ হার মেনে নেন। দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চল নেপালরাজার বলে স্বীকার করে নেন। ইংরেজরা এই সুযোগে নাক গলাতে চায় ওই অঞ্চলে। সিকিমরাজকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ইংরেজ বাহিনী। 'বাহিনী' মানে অবশ্য শ'খানেক সেনা। বন্দুকধারী সেনা। এবার তলোয়ার ও কুকরির বিরুদ্ধে আর তলোয়ার, কুকরির লড়াই নয়, বন্দুকের লড়াই। নেপালরাজ হার মানলেন। ইংরেজদের সঙ্গে নেপালরাজের চুক্তি হল, যা 'তেঁতুলিয়া চুক্তি' হিসেবে পরিচিত। সময়টা ১৮১৭ সাল। ঠিক হল—সিকিম নেপাল সীমান্ত নিয়ে কোনও বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য জানাতে হবে গভর্ণর জেনারেলকে।

১৮২৭ সালে সিকিম-নেপাল সীমান্ত নিয়ে আবার বিরোধ বাধে। বিরোধ মেটাতে ক্যাপ্টেন লয়েড ও গ্রান্টকে পাঠান হয়। বিরোধ মেটাতে দার্জিলিং-এ এসে গ্রান্টের খুবই পছন্দ হয় দার্জিলিং-এর শীতলতা ও পরিবেশ। তিনি দার্জিলিং বিষয়ে তথ্য পাঠান গভর্ণর জেনারেলকে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক একটি সার্ভেয়ারের দল পাঠান। সার্ভে রিপোর্ট পেয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক সিকিমরাজকে অনুরোধ করেন গোটা দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলটি তাঁদের হাতে তুলে দিতে। শক্তিমানের অনুরোধ আদেশের বাবা। ১৮৩৫ সালে সিকিমরাজ দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল ইংরেজদের হাতে তুলে দিলেন।

ইংরেজরা ছোট রেল করলো, চায়ের চাষ শুরু করলো—এ আর এক ইতিহাস।

বাঙালি-গোর্খা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চাইছে সিপিএম

বাবু অশোক ভট্টাচার্য দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সমতলের বাঙালিদের খেপিয়ে তুলে বাঙালি-গোর্খা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনা খুবই নিখুঁত ছিল। ১২ জুন সিপিএম-এর মোটরবাইক বাহিনী গোর্খা বসতি এলাকায় চক্কর মেরে চম্‌কালো। তারপর সিপিএম ১৬-১৮ বছরের ছেলেদের লেলিয়ে দিল। গোর্খা বসতি এলাকায় ব্যাপক সশস্ত্র হামলা চালালো। নন্দীগ্রামের পথই নিতে চাইলো সিপিএম।

এই সশস্ত্র আক্রমণকারীদের 'আমরা বাঙালি' ও 'জনজাগরণ মঞ্চ' বলে প্রচার করেছিল সিপিএম। যেন বাঙালিরা জেগে উঠেছে গোর্খাদের বিরুদ্ধে। বাস্তব সত্য অন্য কথা বলে। আনন্দমার্গীদের গণসংগঠন 'আমরা বাঙালি'। কলকাতার বিজন সেতুতে দিনে দুপুরে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের গায়ে পেট্রল ঢেলে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছিল সিপিএম পার্টি। শয়ে শয়ে লোক সেই বর্বর হত্যা দৃশ্য দেখেছে, কিন্তু লাল সন্ত্রাসের বিরোধীতা করতে সাহস পায়নি। এই ঘটনার পর থেকে সিপিএম-এর সঙ্গে 'আনন্দমার্গী' ও 'আমরা বাঙালি'-দের সম্পর্ক 'সাপে নেউলে'। অশোকবাবুর কথায় আমরা বাঙালিরা সিপিএম-এর হয়ে গোর্খাপল্লীগুলোতে আক্রমণ করবে—এ অবাস্তব ছিল। 'আমরা বাঙালি' ও জনজাগরণ মঞ্চের নামে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ছিল সিপিএম গুন্ডাবাহিনী, সচেতনভাবে বাঙালি সেন্টিমেন্টকে উস্কে দিতে। কিন্তু বাঙালিরা অত সহজে 'সাম্প্রদায়িক' হয়ে পড়ে না কোনওদিনই।

অশোকবাবু, সিপিএম পার্টির ভাড়াটে গুন্ডা ও পুলিশের সাধ্য নেই দার্জিলিংকে নন্দীগ্রাম বানাবার। পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাতে গেলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদীরাই শেষ হয়ে যাবে। গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনকারীরা আজ গান্ধিবাদী, কিন্তু বেশি খোঁচালে বাঁচার তাগিদে কাল পাল্টা সন্ত্রাসে নামলে তার পরিণাম কী হবে সিপিএম কি একবারও ভেবে দেখেছে?

গোর্খাদের এই লড়াই আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াই। এ লড়াই সম্পূর্ণ জয়ের আগে থামবে বলে মনে হয় না।

গোর্খাল্যান্ডের দাবী : কী এবং কেন?

মনোজ গিরি

গোর্খাল্যান্ডের দাবীর মূল উৎস **উন্নয়ন** নয়, **জাতিসত্ত্বা**। প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল যে উন্নয়ন-এর বিষয়টা আনলে পার্বত্য অঞ্চলের দাবীকে অতি-সরলীকরণ করা হবে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দাবীর সঙ্গে এক করে ফেলা হবে। ঠিক এই ষড়যন্ত্রটাই শাসক শ্রেণি করছে উন্নয়নের প্রশ্ন আর জাতিসত্ত্বার প্রশ্নকে মিলিয়ে ফেলে।

আমরা যুক্তিবাদীরা নিশ্চয়ই এই মিথ্যা যুক্তি মানবো না এবং শাসককুলের মারপ্যাঁচে জড়িয়ে পড়বো না।

অবশ্যই উন্নয়ন, বা বলা যায় উন্নয়নের অভাব এখানকার মানুষের ক্ষোভের অন্যতম কারণ। তবে যারা গোর্খাল্যান্ডের দাবীকে সমর্থন করছে না, তারাও তো উন্নয়নের কথা বলছে। তাহলে কি দার্জিলিং ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল খুব উন্নত?

কলকাতায় একটি বিদ্যাসাগর সেতু ছাড়া আর কী এমন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে? বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর কী এমন উন্নতি হয়েছে? তাহলে বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, শালবনীতে পৃথক রাজ্যের দাবী উঠছে না কেন?

উন্নয়নই একমাত্র সর্বরোগহর মহৌষধ নয় জাতিসত্ত্বার অভ্যুত্থানের।

আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম? সেটাও নিশ্চয়ই উন্নয়নের অভাবের কারণে হয়নি?

তাহলে দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের অভাবটাই গোর্খাল্যান্ডে জনমুক্তি আন্দোলন উঠে আসার প্রধান কারণ—এটা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট যুক্তি নেই। এটা শুধু তথাকথিত মামুলি বুদ্ধিজীবিদের আর ধূর্ত রাজনীতিকদের অপব্যাখ্যা।

তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি গোর্খাল্যান্ডের গণআন্দোলনকে নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন না একসঙ্গে উন্নয়ন আর জাতিসত্ত্বার অধিকারকে তুলে এনে। এই আন্দোলনটা একেবারেই গোর্খাদের মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলনে উঠে আসা কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৭৮০ সাল নাগাদ গোর্খারা সিকিমে হানা দেয় এবং তার অনেকটা অংশ, যার মধ্যে দার্জিলিং ও শিলিগুড়িও পড়ে, তা দখল করে। তারা ঐ অঞ্চল শাসন করে

৩৫ বছর এবং শেষে ব্রিটিশ-নেপাল যুদ্ধে ১৮১৬-র একটি সন্ধিপত্রের মাধ্যমে নেপাল ঐ অঞ্চলটিকে ব্রিটিশের হাতে অর্পণ করে। এর মধ্যে ছিল দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, পুরো তরাই অঞ্চল, সিমলা, নৈনিতাল, গারোয়াল পর্বত, কুমায়ুন সহ—তিস্তা থেকে শতদ্রু নদী পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকাটি।

তারপর অবশ্য দার্জিলিং আরেকবার হস্তান্তরিত হয়েছিল যখন ব্রিটিশ সরকার সিকিমকে তা দিয়ে দেয় এবং আবার ১৮৩৫-এ রাজনৈতিক কারণে তা ফিরিয়েও নেয়। সিপিএম এর বুদ্ধিজীবিরা এবং অন্যান্য গোর্খাল্যান্ড বিরোধী বুদ্ধিজীবিরা শুধু ১৮৩৫ এর কথাই বলছেন, ১৭৮০-র কথা নয়। ইতিহাসের শুরু নিশ্চয়ই ১৮৩৫-এ নয়, তার আগের ঘটনাও আছে!

'লেপচা' নামক জনজাতিরা 'জুম' চাষ করে জীবনযাপন করত। অর্থাৎ যাযাবরের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে চাষ করে বেড়াত। কখনও তারা থাকত নেপালে, কখনও সিকিমে।

লেপচারাই যে এই অঞ্চলের আদি জনজাতি তা আমরা ক্যাপ্টেন লয়েড নামক একজনের লিখিত বিবরণে পাই। তিনি যখন দার্জিলিং অঞ্চলে পদার্পণ করেছিলেন তখন ১০০ টির মত লেপচা কুটির দেখেছিলেন, কথাটি মিথ্যে নয়। শুধু একটা কথা ঠিক, যে ঠিক উনি যখন গেছিলেন, তখন লেপচারা ওখানে আস্তানা গেড়েছিল। অন্য সময়ে গেলে, বা আরেকটু এদিক ওদিক ঘুরলে তিনি অন্যান্য জনজাতি যেমন লিম্বু, মাগার, রাই ইত্যাদিদেরও দেখতে পেতেন। ঐ অঞ্চলটি ছিল তাদের সকলেরই বাসস্থান এবং এরা সবাই গোর্খা-সম্প্রদায়ভুক্ত। মনে রাখবেন, লয়েড সাহেব কিন্তু ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন পর্যটক।

সিপিএমের বুদ্ধিজীবিদের এখন বাঁধা বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই লয়েড কথিত লেপচাদের নাম, যেন তাতে প্রমাণিত হয় গোর্খারা বহিরাগত বিদেশী। আরও যেসব ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্য গোর্খাদের স্বপক্ষে যায়, সেগুলোকে তারা আলোচনাতেই আনতে চান না।

ব্রিটিশ শাসনকালে যখন চায়ের চাষ শুরু হয় ১৮৬৫তে, তখন ন্যারো-গেজ রেললাইন চালু হয় দার্জিলিং অবধি। এই সময়ে বহু মানুষ পাকাপাকিভাবে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। মনে রাখতে হবে—

ক) এ সময়ে লোকেদের আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না।

খ) ওরা জানত অঞ্চলটি দেশীয় রাজাদেরই অধীনে এবং রাজার আদেশেই তারা ব্রিটিশদের চা-শিল্পাঞ্চলে কুলি হিসাবে কাজ করতে আসে।

গ) তারা বুঝত ঐ অঞ্চলটি তাদেরই নিজস্ব বাসভূমি।

যখন এইসব ঘটনাগুলো ঘটছিল, তখন আজকে যে ভারতের মানচিত্র আমরা দেখি তা তৈরিই হয়নি। সমস্ত লোকেরাই ছিল ব্রিটিশদের প্রজা; সে বাঙালিই হোক, কি গোর্খাই হোক।

কিন্তু ১৯৪৭ এর পর ভারত একটি কুখ্যাত চুক্তিতে ঢোকে—১৯৫০-এ শান্তি ও মৈত্রীর চুক্তি সই হয় নেপালের সঙ্গে। এই চুক্তিপত্রের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী পারস্পরিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে ভারত ও নেপাল পরস্পরের নাগরিককে কয়েকটি অধিকার দেবার সিদ্ধান্ত নেয়—যেমন, বসবাস করার ও জমি কেনাবেচার অধিকার, ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার অধিকার, যাতায়াতের অধিকার ইত্যাদি। এই বিভ্রান্তিকর চুক্তি গোর্খাদের ভারতীয় নাগরিকত্বকে সন্দেহজনক ও অনিশ্চিত করে তুলেছে। তাদের **ভারতীয়ত্বকে** খর্ব করেছে। গোর্খা জনজাতিকে একটা পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফসল হিসাবে প্রতিভাত করেছে।

বর্তমান গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন তাদের এই হারানো সত্ত্বাকে খুঁজে পাওয়া ও পুনর্প্রতিষ্ঠা করারই প্রয়াস, একমাত্র পৃথক রাজ্যই তাদের হারানো সত্ত্বাকে ফিরিয়ে দিতে পারে। তার কম কিছুতে নয়।

[আপনারা কল্পনা করুন তো আজ যদি ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার ঐরকম একটা চুক্তি ও তার সাত নম্বর ধারা প্রবর্তন করে, তাহলে সমগ্র ভারতীয় বাঙালি জাতির নাগরিকত্বের কী অবস্থা হবে?] মুশকিল হচ্ছে, শাসকরা যখন চুক্তিপত্রে সই করেন, তখন প্রজাদের মতামত জানতে চান না।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে গোর্খা জনমুক্তি আন্দোলন বাঙালি বিরোধীতা নয় বা পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধতা নয়। **যদি একবার 'গোর্খাল্যান্ড' নামে একটি আলাদা রাজ্য তৈরি হয়, তাহলে আর কখনও অন্যান্য ভারতীয়রা গোর্খাদের অভারতীয় বহিরাগত বলবে না। ভারতীয় হিসাবে গোর্খাদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত হবে।**

অতএব গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন কোনও উন্নয়নের স্বার্থে নয়, জাতিসত্ত্বার অধিকারের আন্দোলন। এবং এই অর্থে এই আন্দোলনটি অন্যান্য রাজ্যের দাবীতে আন্দোলনের চেয়ে একেবারে পৃথক। যেমন, তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ, বুন্দেলখন্ড ইত্যাদি রাজ্যে আন্দোলনের উৎস উন্নয়নের দাবী। গোর্খাল্যান্ডে সেটা পৃথক সত্ত্বার দাবীতে।

✶ ✶ ✶

যাই হোক, এবার আসি উন্নয়নের প্রসঙ্গে।

✶ ব্রিটিশরা যখন দেশ ছেড়ে গেছিল তখন দার্জিলিং-এ ১৮০টি চা-বাগান ছিল। এখন আছে ৮২টি, তার মধ্যে কয়েকটি বন্ধ।

✶ উত্তরবঙ্গে এখন ১৮টি চা-বাগান লক আউট অবস্থায় এবং তার ফলে ৩০ হাজার কর্মী কর্মচ্যুত।

✶ দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চলে দৈনিক মজুরি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন।

তামিলনাড়ু	—	১০১ টাকা
কেরালা	—	৯২ টাকা

কর্ণাটক	—	৯২.৮৫ টাকা
দার্জিলিং-ডুয়ার্স	—	৬৮.৭০ টাকা

(মনে রাখতে হবে ন্যূনতম মজুরি আইনত ১০০ টাকা এবং উপরে অঙ্কগুলির মধ্যে জ্বালানি ও নিম্নমানের রেশনও অন্তর্ভুক্ত।)

✶ সরকারি সিনকোনা বাগান, যাতে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মরত, তা উঠে যেতে চলেছে। সেখানে ব্যাপক দুর্নীতি এবং শোনা যাচ্ছে মালিকপক্ষ এই বাগান অঞ্চল হিন্দুস্তান লিভার গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দিতে চলেছে।

✶ ব্রিটিশ শাসনকালে পাঁচ ছ'টি ছোট মেল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন দার্জিলিং ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে যাতায়াত করত, এবং এই ন্যারো গেজ লাইন রাত্রে মাল পরিবহনের কাজও করত। এখন একটিমাত্র তিন-কামরা বিশিষ্ট ট্রেন এই লাইনে যাতায়াত করে।

✶ পাহাড়ে যত 'রোপ-ওয়ে' আছে, সবই ব্রিটিশ আমলে তৈরি। এই রোপ-ওয়ে সহজে মাল বহন ও কর্মসংস্থান-এর একটা উপায় ছিল। এখন দূরবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে যোগাযোগের এই রোপ-ওয়ে ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

✶ মালবাজার-মাতেলি-ডুয়ার্স, দার্জিলিং এর পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন এই অঞ্চল কেটে ইসলামপুর চোপরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে গোর্খা জনসংখ্যা নেই বললেই চলে। বিধান রায়ের সময়ে এই অন্যায় কাজটি করা হয়েছে যাতে গোর্খারা কোনও সাংসদ পাঠাতে না পারে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে; তারা বাঙালি শাসকশ্রেণির খেয়ালখুশি ও রাজনীতির উপরেই নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

✶ এখানকার পানীয় জলের সমস্যা বিশ্ববিখ্যাত।

✶ রাস্তার অবস্থা বরাবরই বেহাল।

✶ দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC/পার্বত্য পরিষদ)-কে বেশ কয়েকটি বিভাগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কর্মী নিয়োগের ক্ষমতাটি অনুপস্থিত। তার ফলে শিক্ষিত চাকুরীহীন জনসংখ্যা বিশালভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরাই এখন গোর্খাল্যান্ড মুক্তি আন্দোলনের সক্রিয় যোদ্ধা।

গত কুড়ি বছরে পার্বত্য অঞ্চলে একটিও কর্মী নিয়োগ হয়নি।

এখানেই শেষ করছি। এটুকু বলতে পারি—আমি যুক্তিবাদী হিসাবে উপরের এই কথাগুলি কিছু বিচক্ষণ মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি।

[*লেখক কার্শিয়াং-এর একটি নামজাদা স্কুলের শিক্ষক এবং হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট*]

গোর্খাল্যান্ডের দাবী : কয়েকটি ভাবনা

বুদ্ধপ্রভ বাগ

১) ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যে কোনও জনগোষ্ঠীর তাদের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষার দাবী জানানোর অধিকার আছে।

২) এই দাবীর সমর্থনে যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংবিধান অনুমোদন করে।

৩) ভাষাগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র মেনে নিয়ে পৃথক রাজ্যের অনুমোদন ইতিপূর্বে অনেকবার দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি বেশির ভাগই এই নীতিতে স্বাধীনতার পরে তৈরি হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিও আগে অসম প্রদেশের অধীনে ছিল, পরে মূলত ভাষা অনুযায়ী সেগুলি পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি পায়।

৪) শুধুমাত্র প্রশাসনিক সুবিধার জন্য একটি রাজ্যকে ভেঙে দুটি রাজ্য করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে।

৫) সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের অখন্ডতার কোনও ধারণা হয় না। দেশের অখন্ডতার প্রশ্নটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র কিছুদিন আগেই বিহার থেকে ঝাড়খন্ড রাজ্য তৈরি হয়েছে, মধ্যপ্রদেশ ভেঙে হয়েছে ছত্তিশগড়। এতে দেশের অখন্ডতা বিপন্ন হয়নি।

৬) স্বাধীন কাশ্মীরের দাবী যে বিচারে বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতবর্ষের মধ্যেই গোর্খাল্যান্ড নামক কোনও পৃথক রাজ্যের দাবী সেই বিচারে বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়।

৭) শুধুমাত্র সরকার বিরোধী বলেই এই আন্দোলনকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি স্বৈরি মনোভাবের প্রকাশ রয়েছে।

৮) গোর্খাদের স্বতন্ত্ররাজ্যের দাবীটি প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো, ১৮৬৫ সালে প্রথম এই দাবী উঠেছিল।

৯) স্বাধীনতার পর দার্জিলিং থেকে নির্বাচিত বাম সাংসদ এই দাবীর কথা সংসদে তোলেন, সেই সময় বামপন্থীরা গোর্খাদের জাতিগতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা মেনে নিয়েছিলেন।

১০) অন্ধ্রপ্রদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ওঠা তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবী বামপন্থীরা সমর্থন করেছেন।

১১) একসময় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব উঠেছিল

কিন্তু বাঙলাভাষীদের স্বাতন্ত্রের প্রশ্নে বামপন্থীরা এই দাবীর বিরোধিতা করে আন্দোলন করেছিলেন।

১২) গোর্খাদের স্বতন্ত্ররাজ্যের দাবীটির সঙ্গে কামতাপুরীদের দাবী তুলনীয় নয়, কারণ ভাষাগত বিচারে গোর্খাদের ভাষা বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে না। রাজবংশী ভাষা বাংলার একটি উপভাষা যা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা সুকুমার সেনের মতো ভাষাবিদ স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৩) পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নের প্রশ্নটি মনে রাখলে এটাও খেয়াল করে দেখা দরকার পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সুভাষ ঘিসিং নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে উন্নয়নের অর্থ নয়ছয় করেছেন। জনগণের অর্থের এই অপচয় এতদিন চোখ বুজে সরকার মেনে নিয়েছেন। ঘিসিং-এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েতস্তরে অর্থনৈতিক অপরাধ ঘটলে সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধান/সভাপতিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছেন কিন্তু বিপুল অর্থের বিনিময় সত্ত্বেও ঘিসিংকে কিছু বলা হয়নি। এমনকী পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনের প্রশ্নেও সরকার সুভাষ ঘিসিং-এর অগণতান্ত্রিক দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেছেন।

১৪) এই মুহূর্তে গোর্খা পার্বত্য পরিষদের হাতে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাজ্যের আর কোনও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা সেই ক্ষমতার অধিকারী নয়। বর্তমান আন্দোলনের ভিত্তিতে আন্দোলনকারীদের মূল দাবীটিকে পাশ কাটানোর জন্য এই ক্ষমতা আরও প্রসারিত করার কথা ভাবা হচ্ছে বলা শোনা যাচ্ছে, যার মধ্যে একটা অন্যায্য তোষণের ঝোঁক আছে। অথচ এই রাজ্যের প্রতিটি পুরসভা, করপোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সরকারিভাবে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হলেও তাদের হাতে ন্যূনতম কোনও ক্ষমতা নেই। একই রাজ্যের মধ্যে এইরকম স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত কার্যত স্বীকার করে নেয় দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি এলাকার একটা অন্যরকম চরিত্র। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সংবিধানগতভাবে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া হলেও সেখানকার বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি। একই রাজ্যের মধ্যে এরকম বিশেষ সুবিধাযুক্ত অঞ্চল থাকলে বাকি অংশের মানুষ সেটা যেমন খুব সহজভাবে দেখেন না। অন্যদিকে যারা এই সুবিধা ভোগ করেন তারা আরও সুবিধা ও ক্ষমতার দাবী করতে থাকেন এতে কার্যত সমস্যা বাড়ে।

১৫) শুধুমাত্র পাহাড়ি মহকুমাগুলির জন্য সরকারি কর্মচারিরা বিশেষ পাহাড়ভাতা পান (সুন্দরবন এলাকা তুলনায় অনেক অনুন্নত হলেও সেখানে সরকারি কর্মচারিদের সুন্দরবন ভাতা মাসে মাত্র একশ টাকা অথচ পাহাড়ে সেটি সাড়ে সাতশ টাকা)। পাহাড়ে কর্মরত সরকারি কর্মীরা কলকাতা বা নিজের বাড়ি আসার জন্য বিশেষ ভ্রমণভাতা পান যা অন্য কোনও এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পাহাড়ি এলাকায় সরকারের গাড়ির খরচ বেশি কারণ সেখানকার সব গাড়ি পেট্রলচালিত। পাহাড়

এলাকার এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলির জন্য সরকারের বিপুল ব্যয় হয়। পৃথক রাজ্য হলে সরকারের এই ব্যয়গুলির সাশ্রয় হতে পারে।

১৬) গোর্খা পার্বত্য পরিষদের হাতে আরও বেশি ক্ষমতাদানের প্রস্তাব দিয়ে জনমুক্তি মোর্চার মূল দাবীটিকে সরকার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই অতিরিক্ত ক্ষমতাদানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বিচার করে দেখা দরকার—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের অর্থ সরাসরি পার্বত্য পরিষদের হাতে দিলে সরকারের তাতে কোনও আপত্তি নেই, এমনকী পার্বত্য পরিষদের হাতে বিনিয়োগ টানার ক্ষমতাও দেওয়া যেতে পারে বলে সরকারি প্রস্তাব।

(খ) পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান পদটিকে রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী পদমর্যাদায় উন্নীত করা ও সেখানকার কাউন্সিলারদের বিধায়কদের পদমর্যাদা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

মনে রাখা দরকার, সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়নখাতে যেসব টাকা দেন তার বেশিটাই সরাসরি রাজ্যের হাতে আসে, রাজ্যস্তর থেকে সেইসব অর্থ জেলাগুলোয় বন্টন করা হয়। এর আগে রাজীব গান্ধী একবার প্রস্তাব করেছিলেন কেন্দ্রের টাকা সরাসরি জেলাশাসকের কাছে পাঠানোর। তার ফরমূলা ছিল পি. এম. টু ডি. এম. মাইনাস সি. এম.। এই প্রস্তাবকে বামপন্থী সরকার সর্বতোভাবে বিরোধিতা করেছিলেন এবং সেই তীব্র বিরোধিতায় এই ধরনের ব্যবস্থা চালু হতে পারেনি। যদিও এই নীতির পেছনে রাজীব গান্ধীর ভাবনা ছিল প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে আনা। কিন্তু তৎকালীন সরকারি নীতিনির্ধারকরা এই প্রস্তাবকে রাজ্যের আত্মমর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাহলে আজকে এমনই একটা নীতিকে শুধুমাত্র পার্বত্য পরিষদের ক্ষেত্রে চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে কেন?

বর্তমানে কেন্দ্রের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা (ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম বা NREGS) সরাসরি জেলাশাসকের কাছে পাঠানো হয় কাজটিকে সহজ ও দ্রুত করার কথা মনে রেখে। এই প্রকল্পের রূপায়নে এই রাজ্যের অবস্থান অন্য রাজ্যের থেকে অনেক পিছনে একথা কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গেছে। এই পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে সরকারিভাবে বলা হয়েছে যে টাকা পাঠানোর এই পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী এভাবে টাকা পাঠানোয় জেলার নির্দিষ্ট প্রয়োজন না জেনে টাকা আসছে এবং সেটি অব্যবহৃত থাকছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কয়েকদিন আগে 'চব্বিশ ঘন্টা' টিভি চ্যানেলে একটি সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী এই ত্রুটির কথা বলেছেন এবং এই প্রথা বদলের দাবী জানিয়েছেন। তাহলে পার্বত্য পরিষদের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সেই প্রথা চালু করার প্রস্তাব কেন দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়!

বিনিয়োগ টানার অধিকারের ক্ষেত্রটিও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয়

নিয়মানুযায়ী বিনিয়োগ খুঁজে আনার অধিকার রাজ্যের হাতে ছিল না। পুরো অধিকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। রাজ্যের কোনও শিল্পস্থাপনের প্রস্তাবে কেন্দ্রের অনুমোদন লাগত। ১৯৯০-এর দশকে নতুন উদারীকরণ নীতি চালু হওয়ার পর এই নিয়ম বাতিল হয়। বিনিয়োগ টানার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। একসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের এই নীতির জন্য বঞ্চিত হয়েছে বলে প্রচার করা হত, যার সবথেকে বড় উদাহরণ : হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল ও বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত বামপন্থীরা সমালোচনা করলেও একান্তে স্বীকার করেন পুঁজি টানার এই অধিকার না পেলে তাঁদের এই সাম্প্রতিক শিল্পায়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচির কোনও অস্তিত্ব থাকত না। আশ্চর্যের কথা এই যে রাজ্যের হাতে এই অধিকার আসার পর রাজ্য কিন্তু এই অধিকারের বিকেন্দ্রীকরণ করেনি। বর্তমানে রাজ্যে শিল্পস্থাপন বা নতুন বিনিয়োগ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন রাজ্যের শিল্প দফতর বা তার সহযোগী সংস্থা। সেটা শিলিগুড়ি থেকে সাগর সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে রাজ্যের গর্বিত মডেল বলে দাবী করা হয়, যেখানে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে প্রচারিত, কিন্তু সরকারের বহুলপ্রচারিত শিল্পায়ন-প্রয়াস (যা নাকি আমজনতার উন্নতির অভিমুখেই চালিত বলে শোনা যায়) ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এই যজ্ঞে এখনও ব্রাত্য করেই রেখেছে! গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি তো বটেই এমনকি জেলা পরিষদও বিনিয়োগের কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। লক্ষ্য করে দেখা দরকার, সিঙ্গুরে টাটাগোষ্ঠীর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বা পুরুলিয়া-শালবনী কিংবা রাজ্যের অন্যত্র বিনিয়োগের যেসমস্ত সিদ্ধান্তগুলি খুব সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই ঘটেছে রাজ্যস্তরে। সিঙ্গুরের গ্রামপঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি জানতেনই না সেখানে কারখানা তৈরির কথা, যেমন জানতেন না নন্দীগ্রামের পঞ্চায়েত যে সেখানে কেমিক্যাল হাব তৈরি করা হবে! প্রশ্নটা এই যে, রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাপরিষদের হাতে যে বিনিয়োগ টানার ক্ষমতা রাজ্য প্রশাসন এখনও দেননি (তার কারণ যা-ই হোক), শুধুমাত্র গোর্খা পার্বত্য পরিষদের হাতে সেই ক্ষমতা আলাদা করে দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?

গোর্খা পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যানের ও তাদের কাউন্সিলারদের পদমর্যাদা বাড়ানোর প্রস্তাবটিও একইরকম বিভ্রান্তিকর। বর্তমানে জেলাপরিষদের শুধু সভাধিপতির পদটি রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর সমতুল, জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের আলাদা কোনও বিশেষ পদমর্যাদা নেই। জেলাপরিষদ সমগ্র জেলার প্রতিনিধিত্ব করে বলে ধরে নেওয়া যায়। পাশাপাশি, গোর্খা পার্বত্য পরিষদ কেবলমাত্র একটি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত সংস্থা যার কাজের পরিধি একটি জেলার থেকে ছোট। তাহলে কোন বিচারে সেই সংস্থার চেয়ারম্যানকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল বলে

বিবেচনা করা হবে? একই ভাবে সেখানকার কাউন্সিলারদের বিধায়ক-সমতুল বিবেচনা করার কোনও যুক্তি আছে কি? তাছাড়া সাম্প্রতিক আন্দোলনের মূল ভরকেন্দ্র হল পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নের প্রসঙ্গ, কোনও বিশেষ পদের মর্যাদার উন্নয়ন ঘটালে সে অসমাপ্ত উন্নয়নের কী ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে? নিছক কিছু নেতার ক্ষমতাবৃদ্ধি ছাড়া এই প্রস্তাবের বাড়তি কোনও সারবত্তা কোথায়? একই সঙ্গে ভাবা দরকার, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য আরও কয়েকটি সংস্থা রাজ্যে রয়েছে; সেখানকার নির্বাচিত সদস্যরা ভবিষ্যতে এরকম দাবী তুললে তার কী যোগ্য জবাব সরকার দেবেন? এরপরেও আছে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির প্রসঙ্গ। বিধায়ক বা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পেছনে সরকারের ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি, বিধায়কদের জন্য পেনসনের ব্যয়ও রয়েছে। এই বাড়তি ব্যয়ের দায়িত্ব সরকার নেবেন কেন? যেখানে সরকার ইতিমধ্যেই ব্যয়সংকোচের নির্দেশনামা জারি করে সমস্তস্তরে তা চালু রাখার কথা বলছেন সেখানে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তারাই বাড়তি ব্যয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন, এই ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজ্য মন্ত্রীসভায় বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর হাতে একাধিক দফতর থাকায় কাজের সমন্বয়ের অসুবিধা হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে কিন্তু অতিরিক্ত মন্ত্রী আর নিয়োগ করা হবে না বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। এমনকী পরিবেশ দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বভার একজন পূর্ণমন্ত্রীর হাতে ছিল, তাকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে অন্য একজনের হাতে পরিবেশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ, গোর্খা পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে আলাদা করে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল্য করার কথা ভাবা হচ্ছে! উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে নানান সরকারি পদ এখনও শূন্য হয়ে রয়েছে, এমনকী নতুন নানান পদের প্রস্তাব অর্থদফতরের কাছে পাঠানো হলেও সেগুলির অনুমোদন মিলছে না, যার প্রতিটিই রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু গোর্খা পার্বত্য পরিষদের জন্য সব ক্ষেত্রেই সরকার মুক্তহস্ত, এর পেছনে যে অন্যায্য তোষণের মানসিকতা কাজ করছে তাতে কি মূল সমস্যার সমাধান হতে পারে?

১৭) আয়তনের বিচারে প্রস্তাবিত গোর্খাল্যান্ডের সীমানা খুবই ছোট, এ নিয়ে রাজ্য হতে পারে না এমন একটা মত শোনা যাচ্ছে। তথ্য বলছে, দার্জিলিং জেলার আয়তন ৩১৪৯ বর্গকিমি। তার তিনটি মহকুমাসহ কিছু সমতলের এলাকাও প্রস্তাবিত গোর্খাল্যান্ডের সীমানার অন্তর্ভুক্ত। আনুমানিক তার আয়তন কমবেশি ৩০০০ বর্গকিমি হতে পারে। রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া গোয়ার আয়তন ৩৭০২ বর্গকিমি। বিশেষ অবস্থানগত কারণে দিল্লিও একটি স্বতন্ত্ররাজ্য যার আয়তন মাত্র ১৪৮৩ বর্গকিমি।

গোর্খাল্যান্ডের দাবী নিয়ে রাজ্যে যে আন্দোলন চলছে, তার মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি মনে রাখতে অনুরোধ করি।

রাষ্ট্রীয় 'আইনি' সন্ত্রাস

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

হিসেব মেলাতে নও রাজি
যদি কাজি, মহামাত্য, নগর-কোটাল
তোমার অজ্ঞতা নিয়ে খরসান অস্ত্র গড়ে,
ভ্রুক্ষেপহীন ছোঁড়ে ছুঁচলো গরম শিসা
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়
মার্কসীয় নির্জনে তাকে কতদূর যেতে দেবে তুমি?
—অমিতাভ দাশগুপ্ত। "ক্ষমা? কাকে ক্ষমা?"

ঠিক এই প্রশ্নটাই আজ আবার অমোঘ হয়ে ফিরে আসছে। ফিরছে সেইসব মানুষদের চেতনায়, মননে, যারা জীবনভর ওই মার্কসীয় দর্শনেই সমর্পিত মন। কবিতাটিও এই টালমাটাল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আবহে লেখা নয়। ১৪০৪ অর্থাৎ অন্তত ১০ বছর আগেই প্রকাশিত। কবিও বামপন্থী, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এবং নিজেরই জবানবন্দিতে 'স্তালিনপন্থী? না, ততটা নই' এবং 'আমার মাথায় আছেন লেনিন, হৃদয়ে জাহাজ অরোরা'। যখন তিনি লিখছেন, হয়তো প্রকাশের আগের কয়েক মাসের মধ্যে, পশ্চিমবাংলায় কি খুব বড়ো কোনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছিল? অন্তত, তেমনটা মনে পড়ছে না। জমি-জমা কেড়ে নেওয়ার মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাও খুব একটা ঘটেনি। তবু এই কবিই লিখছেন,

"সব কেড়ে নিতে পারো। নিতে পারো সমস্ত দক্ষিণা
বাম করতলে শেষ পূজা দেব—একতাল ঘৃণা"

(দক্ষিণা)

কবিরা সত্যিই অনেক কিছু আগাম দেখতে পান হয়তো। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস স্তালিনবাদী দলের হাতে কী ভয়ংকর, কী কদর্য, কী নিষ্ঠুর হতে পারে, তা আগেই তিনি দেখেছিলেন। যেমন মনিভূষণ ভট্টাচার্য বুঝেছিলেন, কেমন করে 'রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তা ছিঁড়ে নেয় এক খাবলা চুল' (গান্ধীনগর রাত্রি)।

রাষ্ট্রীয়সন্ত্রাস তো আর ক্ষমতাহীনদের কাজ নয়! ক্ষমতাসীনরাও যথেষ্ট আটঘাট বেঁধে সন্ত্রাসটা নামিয়ে আনেন। কেবল 'ছুঁচলো গরম শিসা' দিয়ে তাকে চেনা যায় না। কেবল পাঁচিল দিয়ে কৃষিজমি ঘিরে ভিতরে অসংখ্য পুলিশ ও পুলিশের মতোদের

রেখেই সন্ত্রাসটা হয় না। সন্ত্রাসটা তো ঠিক দেওয়ালির রাতের বাজি পোড়ানোর উৎসব নয়, যে সব শব্দ একদিনে, সব ঝলক একদিনে শেষ করে দিতে হবে! তাকে দীর্ঘস্থায়ী করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী করতে গেলে আবার তার পিছনে দল লাগে, শাসকের দল। কখনও দলের কর্মীরা রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ মদতে সন্ত্রাসটা নামিয়ে আনে। আবার কখনও রাষ্ট্রশক্তি (অর্থাৎ পুলিশ, সেনা, আধা সেনা) দলের মদতে সেই সন্ত্রাসটা চাপিয়ে দেয়। আসলে দুটোই হল একই মুদ্রার এ-পিঠ, ও-পিঠ। কাশ্মীর-গুজরাত, মণিপুর-নাগাল্যান্ড, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, দাদরি, কলিঙ্গনগর—তাদের রঙে, বর্ণে, ব্যাপকতায়, লক্ষ্যে তফাৎ থাকতে পারে; চরিত্রে কোনও তফাৎ নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা এদেশে বারবার ঘটেই চলেছে; সরকারের রঙে, জাতিতে, বর্ণে তফাৎ হওয়া সত্ত্বেও।

সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে হাতিয়ার কেবল অস্ত্রই নয়! শাসক শক্তির সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে 'আইন'। গণতন্ত্রের অর্থ যেহেতু 'আইনের শাসন', তাই শাসনের আইনটা আগেভাগেই নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। তারপর সেই আইনের ইচ্ছামতো প্রয়োগ করেই রাষ্ট্র তার সন্ত্রাসের চেহারাটা স্পষ্ট করতে থাকে। একদিনেই তা স্পষ্ট হয় না, হয় ধীরে ধীরে। যেমন করে তাপকে ধীরে ধীরে সহ্যশক্তিতে সইয়ে নেওয়া হয়। শাসক বুঝতে চায় 'কতটুকু তাপ দিলে পিঙ্গল লোহায় ফোটে লাল সর্বনাশ'। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধকে দমন করতেও ব্যবহৃত হয় সেই আইন। সশস্ত্র বাহিনী তো সেই 'আইনের রক্ষক' হিসাবেই অবতীর্ণ হয়। তাতে যদি কিছু মানুষের সংহার হয়েই যায়, রাষ্ট্রের সহজ ব্যাখ্যা, 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে।' এ-এক মজার গোলকধাঁধা। এর বিরুদ্ধে আইনের দায় রায় বিচার চাইলেও নিস্তার নেই। সেখানে যে আইনে বিচার হবে, সেটা তো রাষ্ট্র আগেই অস্ত্র হিসাবে নিজের হাতে নিয়ে রেখেছে। সেটাই এবার রাষ্ট্র বাঁচাতে বর্ণ হয়, রক্ষাকবচ হয়।

স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই পশ্চিমবাংলায় কৃষক আন্দোলন—তেভাগা এবং বড়া পহলামপুরের (সিঙ্গুর ব্লকে) কৃষক বিদ্রোহ—দমনে এভাবেই পুলিশী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছিল আইনের বর্ণ বা রক্ষাকবচের সাহায্যে। লোকনাট্যের লোককবি গুরুদাস পাল তখন লিখেছিলেন—

"নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন 'নিরপেত্তা'
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি—
পাঁচশো, হাজার, অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।"

তারপর, ১৯৫৯-এর ২৯ আগস্ট কলকাতার শহিদ মিনারে, রাজপথে নেমেছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ৮০ জন নিহত হন। তারপর ৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে, বামশাসনে মরিচঝাঁপিতে, মুর্শিদাবাদে।

সেই স্বাধীনতার, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর গঙ্গা-যমুনা-শতদ্রু-কৃষ্ণা-গোদাবরী-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে যত জল গড়িয়েছে; রক্ষাকবচরূপী আইনের সংখ্যা, কঠোরতা ততই বেড়েছে। যত আইনের বাঁধন কড়া হয়েছে, মানুষ ততই কঠিন নিষ্পেষণে দুর্বিসহ জীবনে পৌঁছেছে। 'মানুষের জন্য আইন' আর থাকেনি, আইন হয়ে গিয়েছে শাসকের জন্য। মানুষকে বাধ্য হয়ে সেই আইনের দাসত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। কোথাও কখনও লড়াই হয়নি, এমনটা নয়। লড়াই করেই মানুষ বেশ কিছু আইনকে বদলাতে, এমনকী ভয়ংকর ভয়ংকর আইনকে বাতিল করতে বাধ্যও করেছেন। আর, যখনই রাষ্ট্রের হাতে সেই সব আইনের সন্ত্রাসী প্রয়োগ একেবারে জনসমক্ষে ধরা পড়ে গেছে; রাষ্ট্র তাড়াতাড়ি তাকে 'একটু' কিংবা 'আরও' মানবিক করার কথা শুনিয়েছে। যেমনটা আমরা দেখলাম মণিপুরে, সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফসপা) প্রসঙ্গে। মনোরমা দেবীকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিক্রিয়ায় জনবিদ্রোহ দমনে প্রধানমন্ত্রী কমিশন বসালেন, আইনটিকে 'আরও' মানবিক করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যেন, আইনটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট মানবিক ছিল। তাকে আরও মানবিক করা হচ্ছে! সরকার একবারের জন্যেও স্বীকার করল না যে ওই আইনটি 'দানবিক'। ফলে, ইরম শর্মিলা চানুর মতো এক সাড়ে পাঁচ ফুটের যুবতি ওই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনশনের ছয় বছর পার করে সাড়ে তিন ফুটে পরিণত হলেও সরকার 'মানবিক' হয়ে **আইনটি প্রত্যাহার করার মতো সাহস দেখাতে পারেনি। শব্দটা 'সাহস' লিখলাম। কারণ কাপুরুষই সাহস দেখাতে পারে না। ফলে, তাকেই সশস্ত্র প্রহরী রেখে, রক্ষাকবচ নিয়ে সাহসী হতে হয়।**

আইন, আইন, আইন...

জনগণের ক্ষোভ বিক্ষোভ চাপা দেওয়ার জন্য পুলিশ আইন যথেষ্ট বলে আর মনে করে না রাষ্ট্র। অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক আইনও যথেষ্ট নয়। এই অবস্থা কি কেন্দ্র, কি রাজ্য—এক। ওইসব আইনের বাইরেও বেশ কিছু এমন আইন আছে, যা দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তার চেহারা প্রকট করে। এমন কয়েকটা হল :

১) দ্য প্রিভেনশন অফ সিডিটিয়াস মিটিংস অ্যাক্ট, ১৯১১ (ব্রিটিশরা বানিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বৈঠক রুখতে। আজও আছে।)

২) আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট ১৯৫৮ (আফসপা)।

৩) ডিস্টার্বড এরিয়াস অ্যাক্ট।

৪) দ্য অ্যান ল'ফুল অ্যাকটিভিটিস (প্রিভেনসন) অ্যাক্ট, ১৯৬৭।

৫) দ্য কনজার্ভেশন অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রিভেনসন অফ স্মাগলিং অ্যাকটিভিটিস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (সংক্ষেপে 'কফেপোসা')।

৬) দ্য ডিস্টার্বড এরিয়াস স্পেশাল কোর্টস অ্যাক্ট, ১৯৭৬।

৭) দ্য ন্যাশানাল সিকিউরিটিস অ্যাক্ট, ১৯৮০ (সংক্ষেপে 'নাসা')।

৮) দ্য প্রিভেনশন অফ ব্ল্যাক মার্কেটিং অ্যান্ড মেইন্টেনেন্স অফ এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট, ১৯৮০।

৯) দ্য মেইন্টেনেন্স অফ ইন্টারনাল সিকিওরিটিস অ্যাক্ট (মিসা) এখন রদ হয়ে গেছে।

১০) দ্য এসেনশিয়াল সার্ভিসেস মেইন্টেনেন্স অ্যাক্ট (এসমা)।

১১) দ্য অ্যান্টি হাইজ্যাকিং অ্যাক্ট, ১৯৮২।

১২) দ্য সাপ্রেশন অফ অ্যানলফুল অ্যাক্টস এগেইনস্ট সেফটি অফ সিভিল এভিয়েসন অ্যাক্ট ১৯৮২।

১৩) দ্য টেররিস্ট অ্যান্ড ডিসরাপটিভ অ্যাকটিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৮৭ (টাডা) (জনবিদ্রোহের মুখে ১৯৯৫-র মে মাস থেকে আইনটি বাতিল হয়েছে।)।

১৪) দ্য রিলিজিয়াস ইন্সটিটিউশন (প্রিভেনশন অফ মিসইউজ) অর্ডন্যান্স ১৯৮৮।

১৫) দ্য প্রিভেনশন অফ ইল্লিসিট ট্র্যাফিক ইন নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রোপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৮।

১৬) দ্য ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট।

১৭) দ্য ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট, ২০০০।

১৮) দ্য প্রিভেনশন অফ টেররিজম অ্যাক্ট (পোটা) ২০০০ (২০০৪ এর ২১ সেপ্টেম্বর থেকে জনমতের চাপে সরকার এই আইনটি প্রত্যাহার করেছে)।

এমন আরও অনেক কেন্দ্রীয় আইন আছে যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সহায়ক এবং এখানেই শেষ নয়। বেশ কিছু রাজ্য নিজস্ব কিছু আইন বসিয়েছে সন্ত্রাস প্রতিরোধের নামে। কার্যত 'আইনি' রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সুযোগ নিতে। যেমন—

ক) দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট, ১৯৭৮।

খ) দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর প্রিভেনশন অফ ইল্লিসিট ট্র্যাফিক ইন নার্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৮।

গ) দ্য আসাম প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট, ১৯৮০।

ঘ) দ্য মহারাষ্ট্র প্রিভেনশন অফ কম্যুনাল, অ্যান্টি-সোস্যাল অ্যান্ড আদার ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্ট, ১৯৮০।

ঙ) দ্য বিহার কন্ট্রোল অফ ক্রাইমস অ্যাক্ট, ১৯৮১।

চ) দ্য মহারাষ্ট্র প্রিভেনশন অফ ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিটিস অফ স্লামলর্ডস, বুটলেগার্স অ্যান্ড ড্রাগ অফেন্ডার্স অ্যাক্ট, ১৯৮১।

ছ) দ্য তামিলনাড়ু প্রিভেনশন অফ ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিটিস অফ বুটলেগার্স, ড্রাগ অফেন্ডার্স, গুন্ডাস, ইমমোরাল ট্র্যাফিক অফেন্ডার্স অ্যান্ড স্লাম-গ্র্যাবার্স অ্যাক্ট, ১৯৮৫।

জ) দ্য গুজরাট প্রিভেনশন অফ অ্যান্টিসোস্যাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (সংক্ষেপে-পাসা)।

ঝ) দ্য কর্ণাটক প্রিভেনশন অফ ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিটিস অফ বুটলেগার্স, ড্রাগ অফেন্ডার্স, গ্যাম্বলার্স, গুন্ডাস, ইমমোরাল ট্র্যাফিক অফেন্ডার্স অ্যান্ড স্লাম গ্র্যাবার্স অ্যাক্ট, ১৯৮৫।

ঞ) দ্য অন্ধ্রপ্রদেশ প্রিভেনশন অফ ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিটিস অফ বুটলেগার্স, ড্যাকয়েটস, ড্রাগ অফেন্ডার্স, গুন্ডাস, ইমমোরাল ট্র্যাফিক অফেন্ডার্স অ্যান্ড স্লাম গ্র্যাবার্স অ্যাক্ট, ১৯৮৫।

ট) দ্য মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অফ অর্গানাইজড ক্রিমিন্যালস অ্যাক্ট (সংক্ষেপে মোকা)।

এই শেষোক্ত আইনটির ধাঁচে তামিলনাড়ুর একটি এবং গুজরাতের একটি নিজস্ব আইনও আছে। ভয়াবহ ও দানবীয় সেই আইন। পশ্চিমবাংলায় এমনই একটি আইন—পোকা বা প্রিভেনশন অফ অর্গানাইজড ক্রিমিনালস অ্যাক্ট একবার প্রস্তাবিত হয়েছিল কয়েক বছর আগে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সত্যিই কি এত রকমের পৃথক পৃথক আইন এতই প্রয়োজন। এসব আইন কি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের সহায়ক? কিংবা এসব আইন রূপায়ণের অভিজ্ঞতা কী? মানুষ তত্ত্বগত দিক দিয়ে নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে কোনও বিষয়কে বোঝেন। তাই অভিজ্ঞতার নিরিখে আসুন টাডা, পোটা এবং পাসাকে দেখা যাক। ইতিমধ্যেই আফসপা মণিপুর সহ সমগ্র উত্তর ভারতকে কতটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তা আমরা প্রতিনিয়ত জানতে পারি। উত্তর পূর্বের কোনও রাজ্যে আজ অন্যান্য প্রদেশের বাসিন্দাদের 'ইন্ডিয়ান' বলে চিহ্নিত করেন। অথচ, নিজেদের তারা আর 'ইন্ডিয়ান' বলেন না। ভারতবর্ষটাকে তারা বিদেশ ভাবতে শুরু করেছেন বা বাধ্য হচ্ছেন।

যাদবপুরের পাঁচ সাহসী মেয়ে

নিজেদের নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা ও সেই সুস্পষ্ট ধারণা বজায় রাখার উপরে দেশের গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র যাতে গদিতে বসা দলের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে, তার জন্যে বহুমত-সম্বলিত গণতন্ত্রের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আবশ্যিক শর্ত।

যাদবপুরের 'ফোরাম অফ আর্টস'-এর সদস্য পাঁচটি মেয়ে—পূজা বসু, জয়িতা দাস, অন্বেষা সরকার, সোমদত্তা মুখোপাধ্যায় ও দেবলীনা চক্রবর্তী—পড়াশোনার পাশাপাশি দৃঢ় সমাজচেতনার পরিচয় দিয়ে সম্প্রতি পুলিশ ও সিপিএম-এর হামলার শিকার হন। এমন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাঁরা যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা নজীরবিহীন। তাদের সাহসিকতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সচেতনতা অনুকরণযোগ্য। তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

ভন্ডামীর জগতে বরুণ সেনগুপ্ত একজন ব্যতিক্রম

প্রবীর ঘোষ

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রীর গদি আঁকড়ে থাকতে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। এমার্জেন্সি-জুজুর ভয়ে বিরোধীরা সব ঠান্ডা। পত্রিকায় 'সেনসার' চালু হয়েছে। কী ছাপা হবে, কী নয়, সবই ছাপার আগে দেখিয়ে নিচ্ছেন পত্রিকার সম্পাদকরা। দেখছেন বিশ্বস্ত বা বশংবদ কিছু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। সিপিএম তখন এই বঙ্গের কেন্দ্র বিরোধী বাঘ-সিংহ পার্টি। এমার্জেন্সিতে 'মিসা' কালাকানুন চালু হতেই গ্রেপ্তারের ভয়ে বাঘেরা সব ভোল পাল্টে বেড়াল। সাংবাদিকরাও ভয়ে বা বাধ্য হয়ে নতজানু।

সেদিন বাংলার দুই আপসহীন সাংবাদিককে দেখেছিলাম, যাঁরা ডিক্টেটর ইন্দিরাকে ছেড়ে কথা বলেননি। অকুতোভয় এই দুই সাংবাদিক হলেন বরুণ সেনগুপ্ত ও গৌরকিশোর ঘোষ। গণতন্ত্র বিরোধী ইন্দিরা গান্ধি গণতন্ত্রের পূজারী এই দুই সাংবাদিকের এমন বেয়াদপী সহ্য করেননি। দু'জনকেই মিসায় গ্রেপ্তার করেছিলেন। এক জেল থেকে আর এক জেলে পাঠিয়েছেন তাঁদের মনোবল ভাঙতে। এই সময় দুই সাংবাদিকের বন্ধুরাও তাঁদের সঙ্গে জেলে গিয়ে দেখা করার মতো হঠকারি কাজ করতে সাহস পাননি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অবশ্য সে হিম্মৎ দেখিয়েছেন।

১৯৭৫-এ আমার চোখে হিরো হয়ে উঠেছিলেন বরুণ সেনগুপ্ত ও গৌরকিশোর ঘোষ।

বরুণ সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল অতি সামান্য। বার ছয়-সাত তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। হাঁটা-চলায়-ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন সংবাদ জগতের উত্তমকুমার। তখন আনন্দবাজার পত্রিকা আমাকে টানতো বরুণ সেনগুপ্তের কলম 'রাজ্য-রাজনীতি'র জন্য। কী আশ্চর্য সহজ-সরল ভাষার ব্যবহার। ভাষার ভারে বক্তব্যকে দূরূহ করা কোনও আঁতলামি নেই। বনগাঁ থেকে বাঁকুড়া, কাশীপুর থেকে মেদিনীপুরের নিম্নবধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত—প্রত্যেকের মনে সোজা গিয়ে বিঁধতো।

বড় পত্রিকাগোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে গিয়ে বড় পত্রিকাগোষ্ঠী তৈরি করতে পেরেছিলেন একমাত্র বরুণ সেনগুপ্ত। ১৯৮৪-তে আনন্দবাজার ছাড়েন নিজেই কাগজ বার করবেন বলে। সে বছরই ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হল 'বর্তমান'। একদল নতুন, অনভিজ্ঞ সাংবাদিকদের নিয়ে বরুণবাবু যাত্রা শুরু করেছিলেন। 'বর্তমান' এলো

এবং মানুষের মন জয় করে নিল। তারপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। এ এক অসম্ভবকে সম্ভব করার ইতিহাস।

১৯৯৬ সালের আগস্টে আমাদের সমিতির ছেলে-মেয়েরা হাওড়ার ভান্ডারদহে অভিযান চালায় গোরাবাবার বুজরুকি ফাঁস করতে। বর্তমান পত্রিকায় এমনভাবে খবরটি প্রকাশিত হয় যেন আমরা গোরাবাবার আশ্রমে গিয়ে ডাকাতি করেছি। খবরটা পড়ে বরুণবাবুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। তিনি বললেন, কোনও চিন্তা করবেন না, কেউই বিশ্বাস করবে না, আপনি যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা চিঠির আকারে লিখে পাঠিয়ে দিন, আমরা ছাপবো। কোনও সহকর্মী নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি।

তিনি তাঁর কর্মচারীদের প্রত্যেককেই সহকর্মী বলতেন। এমন উদার, সাদাকে 'সাদা', কালোকে 'কালো' বলা উচ্চশির মানুষটি চলে গেলেন। রেখে গেলেন সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতার এক জ্বলন্ত ও অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত।

স্বাধীন দেশের সংশোধানাগার

মাদকাশক্তি ও অস্বাভাবিক যৌনজীবন দেশের সংশোধনাগারগুলিকে এইডস্ রোগের আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছে। এই খবর প্রশাসনই দিচ্ছে। নামে সংশোধনাগার হলেও এই স্থানগুলি যে যাবতীয় দুষ্কর্মের ডিপো তা বহুদিন ধরেই সকলের জানা। কিন্তু প্রশাসনিক বাবুদের টনক নড়েছে যখন দেখা গেছে এই ভয়ঙ্কর রকম সংক্রামক রোগ নিয়ে হাজতবাসের মেয়াদ শেষ করে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীরা সমাজের মূলস্রোতকে সংক্রামিত করতে চলেছে। বাঃ, সবচেয়ে কড়া নিরাপত্তা যেখানে, সেই তিহার জেলেও বন্দীদের মধ্যে এইচ. আই. ভি. সংক্রমণের হার প্রবল। এখানকার জনসংযোগ আধিকারিক নিজেই বলছেন যে ড্রাগ ঢুকছে কারারক্ষীদের মারফৎ। অথচ তাদের আটকানো যাচ্ছে না। কেন? তাদের কি শাস্তি প্রাপ্য নয়? তারা কি আইনের ঊর্দ্ধে? অপরাধী হয়েও যারা সুস্থ ছিলেন, তাদের অসুস্থ, বিকৃতকাম করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টিতে যারা মদৎ দিচ্ছে, তারা কি আরও বড় অপরাধী নয়? একটা সুঁচ দিয়ে অনেকে ড্রাগ নিচ্ছে, সমকামী জীবন-যাপন করছে—এই পরিবেশের নাম 'সংশোধনাগার'? এখানেও সেই দোষীদের শাস্তি না দেওয়ার খেলা। এর অর্থ একটাই—ড্রাগ পাচার চক্র তাদের ভাল মার্কেট পাচ্ছে জেলগুলিতে এবং এই চক্রে যুক্ত জেলের বাইরে যারা আছে তারাই। নয়ত বন্ধ করা যাবে না কেন?

৬১ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এইসব বন্দীদের কথা মনে হল। জুন মাসের শেষ তারিখে এই খবরটা বেরিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের এই চিত্রটা কি শুধুই কারাবন্দীদের? এর থেকেই কি সামগ্রিক ভাবে দেশের চিত্রটি আসে না? প্রথমত, স্বাধীনতা মানে কি শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা? সরকারি অফিসারদের যা খুশি বেআইনী কাজ করে পার পেয়ে যাবার স্বাধীনতা? না সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, অযাচিত সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজেদের খুশিমত খেয়ে পরে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা?

নেতা হতে হলে...

মানসী মল্লিক

গত ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে যুক্তিবাদী সমিতির নাম শোনা। ২০০৩ সালের জুলাই-এ আমার প্রথম প্রবেশ। এখনও আছি। কেন আছি? অনেক দুষিত বাতাসের মাঝে একটু খোলা হাওয়া, সবুজ প্রাণের চাষ, বিশুদ্ধ অক্সিজেন। তাই অনেক আনন্দ, ভাললাগা, তার সাথে অ্যাডভেঞ্চারের মজা, বৌদ্ধিক উন্নতি, জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ, সবকিছু মিলে স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা একটি স্থান। মাঝে মাঝে তাই মনে হয়েছে যুক্তিবাদী সমিতি আমার জীবনে একটি নতুন ক্যানভাস। সমিতি ঘিরে নানারকম দিনগুলো—সম্মেলন, বইমেলা, ভান্ডাফোঁড়, স্টাডিক্লাস, সবকিছু যেন এক একটি রং-এর পাত্র। প্রতিটি রং-এ খুঁজে বেড়াই আমার জীবনচর্চার প্রতিটি অনুভূতিকে আর সমিতির প্রতিটি মানুষ আমার কাছে সেই কল্পনার তুলি। যাদের নিয়ে আমি আমার মনের প্যালেটে যেমন খুশি রং মেশাই।

শিল্পীর ক্যানভাস শিল্পীর মনের আয়না। একে ঘিরে থাকা বহু সাধ-স্বপ্ন। এত কথা কেন বলছি? আসলে সমিতিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসার শেষটুকু বোঝাতে চেষ্টা করছি। শুধু আমি নই। সমিতিকে ভালবাসার মত মানুষের অভাব নেই। কিন্তু আসল প্রশ্ন কে কিভাবে ভালবাসে? ভালবেসে শুধু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্ধুর মত পথ চলতে চায়? না, নিষ্ঠুর প্রেমিকের মত শুধু যুক্তিবাদী সমিতিকে নিংড়ে পেতে চায়? দখল করত চায়? ক্ষমতার লোভ, নেতা হবার লোভ, অর্থ লোভ একটু একটু করে একদা আদর্শবাদী মানুষটিকে নিষ্ঠুর মানুষে পরিণত করে। এটা একটা 'প্রসেস'। তাই আমাদের সমিতির 'কোর বডি' চিরস্থায়ী কোনও বন্দোবস্ত নয়।

ভোট নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোয় স্বার্থবুদ্ধির কারণে নেতা যায় নেতা আসে। কিন্তু যুক্তিবাদী সমিতি এক অন্য রাজ্য। এখানে জিততে হলে চাই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। চাই অনেক কিছু জানা বোঝার একটি মন ও মাথা। নেতাকে হতে হবে অনেক গুণের অধিকারী। যেমন—

১) সৎ ও স্বচ্ছ।

২) ভাল মানের মানুষ।

৩) ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ।

৪) স্থূল কুসংস্কারের উর্দ্ধে।

৫) নিরপেক্ষ।

৬) শক্ত মানুষ, কিন্তু নিষ্ঠুর নয়।

মনে রাখতে হবে সীমিত জ্ঞান নিয়ে নেতা হওয়া যায় না। জ্ঞানচর্চা বন্ধ করে শুধু হৈ হৈ করলে কিছু মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়া যায় ঠিকই, যেমন লালুপ্রসাদ থেকে সোমেন মিত্র, কিন্তু আদর্শবাদীদের চোখের মণি হয়ে ওঠা যায় না।

'জ্ঞান' মানে পৃথিবীর সবকিছু জেনে বসে থাকা নয়। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শীদের সাহায্য নেওয়ার কথা নেতার মাথায় থাকতে হবে। কোনও বিষয়ে না জানা থাকলে পরিস্কার বলা—'জানিনা'। অথবা জেনে, পড়ে বলা। এরকম হলে নেতার সম্মান বাড়বে। নতুবা নেতা হিসাবে মূল্য কমে যাবে।

কখনো দেখেছি কিছু কিছু উপনেতা দলের কর্মীদের সামনে তাৎক্ষণিক চটক্‌দারি বক্তব্য রেখে, যেমন— "আমাদের নিজেদের খাওয়ার চাল থেকে প্রতিদিন এক মুঠো করে চাল জমাতে হবে সমিতির জন্য।" "প্রতিটি ছোট-বড় দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতেই হবে।" প্রচুর হাততালি পাওয়া উপনেতাদের কে গত আট বছরে কত কিলো চাল জমিয়ে সমিতিকে দিয়েছে আমরা জানতে পারিনি। আবার কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি, দালালির বিনিময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি করে চলেছে। এভাবে নিজেকে জোর করে নেতা বোঝাবার চেষ্টা করে অনেকেই। কিন্তু খুব সত্যি কথা হল, যুক্তিবাদ যাদের মনে বাসা করেছে, এইসব চটুল কথার খোলস ছাড়িয়ে সত্যি বোঝার ক্ষমতা তাদের আছে।

দ্বিতীয় গুণ ভাল মনের মানুষ হওয়া। অর্থাৎ শোষিত ও সহযোদ্ধাদের ভালবেসে কাছে টেনে নেওয়া।

মনে রাখতে হবে, যুক্তিবাদী সমিতি কোনও রাজনৈতিক দল নয়, যে অন্য সাধারণ সদস্যরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কিছু পাওয়ার আশায় নেতাকে তোয়াজ করবে। এখানে সবাই মিলেমিশে একটি 'গ্রাম', একটি 'কমিউন' যা সাম্যের আদর্শ চিন্তা দিয়ে তৈরি। আর সেই কমিউনে বা গ্রামে যারাই আসে সকলে নিয়ে আসে আন্তরিকতা। তাই তারা পেতে চায় বিশ্বাস ও ভরসা মাখানো ও ভালবাসা দিয়ে মোড়া একটি সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি হবে পারস্পরিক। আর সেই জায়গাটায় যখন আঘাত লাগবে, যখন মেকি নেতার মুখোশের বাইরে মুখ স্পষ্ট হবে সে সরে যাবে বা সরে যেতে বাধ্য হবে নেতার পাশ থেকে।

এই সমিতির নেতা হওয়া মানে কিন্তু শুধু বহু মনোজগতের সিংহাসন পাওয়া নয়। পালন করতে হবে অনেক দায়িত্ব। বাৎসরিক নানারকম অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে, আর ব্যয়ের চিন্তা, স্টাডিক্লাস, সম্মেলন, বইমেলা, শাখাগুলোর ভাল-খারাপ খবর রাখা ও নজরদারি করা, তাদের সুবিধে-অসুবিধে বোঝা, সমস্যার সমাধান, উৎসাহ দেওয়া, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান, বই প্রকাশ, সম্পাদনা, সময়মত

রেজিস্ট্রেশন রিনিউ করা, বহিরাক্রমণ, অজানা আক্রমণ এর জন্য সতর্ক থাকা, নেপাল, গোর্খাল্যান্ড থেকে সংরক্ষণ—প্রতিটি ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, আছে আরও অনেক খুঁটি-নাটি বিষয়।

শুধু তাত্ত্বিক নেতা হয়ে বসে থাকলে আর অন্যদের ফরমাশ দিলে কেউ গ্রহণ করবে না। একজন অফিসের বস্ তা পারেন। কারণ তিনি জানেন, তাঁর জন্য কর্মচারীকে যথাযথ 'পে' করা হয়। সুতরাং সকলকে ভালবাসতে না জানলে নেতা তার পায়ের তলায় মাটি শক্ত রাখতে পারবে না। হয়ত কেউ তাকে সরিয়ে দেবে না। বরং সকলে সরে যাবে তার পাশ থেকে।

নেতার 'ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য' রাখা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নেতাকে আদর্শ করে এগোতে চাইলে, তার ব্যক্তিগত গুণাবলী সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করবে সদস্যরা। তার চ্যুতি অন্যের চোখে বিশ্বাস নষ্ট করে, ভরসা হারায়। একজন আদর্শ স্থানীয় মানুষের প্রতি ঘৃণা আসা সাধারণের কাছে খুব খারাপ সংকেত। তা ভবিষ্যতের নেতার প্রতি বিশ্বাসের জায়গাটিও নষ্ট করে। শত্রুরা পরিকল্পিত ভাবে এমনটা করতেই পারে। যেমন সিপিএম প্রচার করে—মমতা পাগল। তখন আলাপ-আলোচনায়, আড্ডায় এই ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরা প্রয়োজন। ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করতেই প্রয়োজন।

সাম্যের স্বপ্নদেখা যুক্তিবাদী মানুষগুলো চায় একসাথে লড়াই করে, আনন্দ করে, একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। এই কাজের মধ্যেই আনন্দ। সুতরাং সমিতির প্রতিটি নেতার মাথায় রাখতে হবে, জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ—সমিতির প্রতিটি কাজে হাতে হাত মেলাতে হবে নেতাকেও। নাহলে কেউ তাকে গ্রহণ করবে না।

প্রধান নেতৃত্বকে ভাবতেই হবে, ভাবী প্রজন্মের কাছে যে সোনার চাবিকাঠি তুলে দিতে চলেছ, সে ভার তারা কতটা বইতে সক্ষম। তা না হলে একদিন এমনও দিন আসবে, চাবি খুলে দেখবো সোনার বাক্স শূন্যতায় ভরা। কারণ এ বাক্স বান্ডিল বান্ডিল নোটের নয়, হিরে-মণি-মুক্তার নয়। এ বাক্স ভরা আছে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ—যা আন্তরিকভাবে ধরে রাখতে হলে চাই কঠিন আত্মপ্রত্যয়। গায়ের জোরে নয়। মুখে ও কাজে আলাদা হয়ে গেলে চলবে না, বা চটকদারি কাজ দেখিয়েও নয়।

নেতা সাজে নয়, কাজে হতে হয়। তার সাহস, সততা, জ্ঞানের পরিধি, আন্তরিকতা, সবকিছু মিলেই সকলের মনের ভেতরে সেই মানুষটা একটু একটু করে নেতা হয়ে ওঠে।

মানসিক চাপ কমাতে—মনের কথা খুলে বলুন

খুশবন্ত সিং

বেশি চাপের মধ্যে থাকলে শরীরের বয়স বছরের হিসাবে বয়সের চেয়ে ত্রিশগুণ বেড়ে যেতে পারে। দ্য উইক পত্রিকা মানসিক চাপ বা 'স্ট্রেস' এর মোকাবিলা করার উপায় নিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ও সাধারণ কাজের মানুষের লেখা প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে আছেন এই নব্বই পেরোনো সাংবাদিক, যিনি হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক ও যুক্তিবাদী।

আমি কখনও বিষাদগ্রস্ত হইনা। অবশ্যই আমারও জীবনে অনেক সময়েই ধাক্কা এসেছে এবং প্রতিবারই কাজ ও আরও কাজ আমাকে এই ধাক্কা সামলাতে সাহায্য করেছে। যখন আমাকে 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'র কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়, আমি একটা উপন্যাসের কাজ শুরু করি। আর ঐ বরখাস্তের ঘটনাটাই আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। না, আমি কখনও একাকীত্ব বোধ করি না, যদিও আমি একাই থাকি। আমার সব সমসাময়িকরা চলে গিয়ে আমি এখন পথে একলা পথিক, কিন্তু আমার লেখাই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বরাবরই আমি খুব সকালে উঠি। আর দিন শুরু হয় খবরের কাগজ পড়ে আর শব্দছক কষে। আমার কাজের মধ্যে আর কাজের সময়সীমার মধ্যে আমি কোনও টেনশনকেই আসতে দিই না। দিনের শুরুতেই আমি সারাদিনের কাজের একটা তালিকা করে নিই, যেটা দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। আর শেষ না করে রাত্রে শুতে যাই না। হ্যাঁ, যাই হোক, ডেড্‌লাইন আমাকে রক্ষা করতেই হবে।

কাজের কোনও বিকল্প নেই। অনেককাল আগে যখন আমার বয়স ৬৯ আমি তখন হিন্দুস্তান টাইম্‌স-এর সম্পাদক হিসাবে তিন বছর সম্পূর্ণ করেছি, কনট্র্যাক্ট রিনিউ করার সময় উপস্থিত। সেই সময় কে. কে. বিড়লা বল্লেন আপনার কি অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা আছে? আমি বলেছিলাম, 'বিড়লাজী, অবসর তো আমি একেবারে শ্মশানঘাটেই নেব'। আমি জীবনে একমুহূর্তও নষ্ট করিনি পুজো-প্রার্থনার পিছনে। তথাকথিত ঐসব 'প্রেম করা'তেও কোনও সময় অপচয় করিনি। না, এখনও এই আই.পি.এল. ম্যাচ দেখেও নষ্ট করিনি কাজের সময়।

মানসিকভাবে আমি অত্যন্ত শক্ত। আর কদাচিৎ রাগ করি বা বিরক্ত হই। প্রতিদিন আমি বেশ কয়েকটি গালিগালাজ-পূর্ণ চিঠি পাই, আমাকে বাছা বাছা গালি দিয়ে, আমি ডান রাজনীতির বিপক্ষে, আমি সংখ্যালঘুদের পক্ষে ইত্যাদি বলে। আমার

কখনও এইসব সমালোচকদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার কথা মনে হয়নি। আসলে আমি খুব একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ নই। এমনকি আমার পুরনো বন্ধুস্থানীয়রাও যখন আমার বিরুদ্ধে কেস করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিইনি। বদলা নেওয়া আমার ধাতে নেই।

আজ আমার একটাই চিন্তা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ও সাম্প্রদায়িক শক্তির অভ্যুত্থান। তরুণ প্রজন্মের এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার খুব দরকার।

সব সময়ে নিজের মত প্রকাশ করা উচিৎ। ছোটবেলা থেকেই আমার স্পষ্ট কথা বলা অভ্যাস। অবশ্য তার জন্যে সমস্যায়ও পড়তে হয়েছে। আমি দীর্ঘদিন একটি বিশেষ সন্ত্রাসবাদী দলের হিট-লিস্টে ছিলাম, ১৫ বছর আমার বাড়িতে পাহারা ছিল।

তবে মৃত্যুর ভয় আমার নেই। মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। তাই নিয়ে অনর্থক চিন্তা করে লাভ নেই; শুধু মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই হল। আসাদুল্লা খান গালিব লিখেছিলেন— "বয়স ঘোড়ার মত দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে / কোথায় গিয়ে থামবে কে বা জানে / লাগাম তো আমাদের হাতে নেই / আর পা দুটোও নেই রেকাবে।"

সৌজন্যে : 'দ্য উইক' পত্রিকা, ২৯ জুন ২০০৮
অনুবাদ : সুমিত্রা পদ্মনাভন

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবহেলা ও অত্যাচারের শাস্তি জেল হাজত

✶ কম করে তিন মাস জেল এবং ৫০০০ টাকা জরিমানা।
✶ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং আইনী উত্তরাধিকারীরা এই আইনের আওতায় পড়ছে।
✶ তাদের কর্তব্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতামাতা বা অভিভাবকদের—
—খাওয়াদাওয়া
—পোষাক পরিচ্ছদ
—বাসস্থান
—চিকিৎসার ব্যবস্থা
ও বিনোদনের দায়িত্ব নেওয়া। অন্যথা 'দি মেনটেনেন্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস্ অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স্ অ্যাক্ট ২০০৭ (ডিসেম্বর ২০০৭-এ পাশ হয়েছে) অনুযায়ী শাস্তি প্রাপ্য।
✶ এর সুবিধা পাবেন জন্মদাতা পিতা-মাতা, পালক পিতা বা মাতা এবং সৎ-বাবা মায়েরাও।
✶ 'সিনিয়র সিটিজেন' বলতে বোঝাচ্ছে ৬০ বছরের উর্দ্ধে যে কেউ।

'যুক্তি-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ' এবং...

সুতীর্থ সিংহ

দিনকয়েক আগে এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টিভির চ্যানেল সার্ফ করতে করতে 'চ্যানেল ভিশন'-এ এসে চোখ আটকে গেল। সেখানে লেখা পরবর্তী অনুষ্ঠান 'যুক্তি, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ'। ব্যাপারটা কী দেখা জন্য সেখানেই থেমে গেলাম। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৮ থেকে ৯টা এই শিরোনামের অনুষ্ঠানে হাজির থাকেন অর্চনা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সঞ্চালিকা বললেন অনুষ্ঠানটি যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ঠাসা। জ্যোতিষী অর্চনা চক্রবর্তীকে দেখে মনে পড়ল যে এর অনুষ্ঠান আগেও দেখেছি। তিনি চেষ্টা করেন অক্ষম কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে। যেমন— অনুষ্ঠানটিতে শুনলাম যজ্ঞ করলে বা শঙ্খ বাজালে নাকি জীবাণু মারা যায়। এমন কোন ধরণের জীবাণু (যেমন— কলেরা বা টিবির) মারা যায়, বা ঐ জীবাণু যেখানে আছে সেখানে যজ্ঞ করলে বা শঙ্খ বাজালে ঐ জীবাণুঘটিত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কিনা তার কোনো উত্তর কিন্তু তিনি দেননি। এইরকম আরও অনেক 'অশ্বডিম্ব' মার্কা অপব্যাখ্যায় ভর্তি ছিল অনুষ্ঠানটি। কিন্তু তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।

ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে যুক্তিবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছে। আর তাই, জ্যোতিষ এবং অলৌকিকত্বের দাবিদাররা তাদের নাম বা অনুষ্ঠানের নামের আগে যুক্তিবাদী শব্দটি বসিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, যেমন যুক্তিবাদী জ্যোতিষী। উপরের অনুষ্ঠানটির নামটিও তো মনে হল আমাদের সমিতি অর্থাৎ 'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'-র থেকে ধার করা। এইভাবে এই সমস্ত লোকেরা নিজেদের প্রচার চালাচ্ছে আর চ্যানেলগুলোও পয়সার বিনিময়ে স্লট বিক্রি করে এই রাবিশ প্রচারে সাহায্য করছে।

বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতি হয়েছে। গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র Cellphone-এর বিবর্তন থেকেই এর আঁচ পাওয়া যায়। এখন মানুষ চায় সবকিছুর মধ্যেই বিজ্ঞানসম্মত কারণ খুঁজতে। আর মানুষের এই প্রবণতাকে হাতিয়ার করে, কোথাও আধুনিক প্রযুক্তিকে আশ্রয় করে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্মৃতিশক্তি বাড়াবার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করছে মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর মতো লোকেরা। কোথাও বা আবার বিজ্ঞানের নাম করে বলা হচ্ছে

মিথ্যা কথা। অপব্যাখ্যা হচ্ছে বিজ্ঞানের (যেমন— মানুষের চারিদিকে নাকি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আছে, বা ক্রিস্টালের শ্রীযন্ত্রমের চারিদিকে নাকি তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়, যা সর্বৈব মিথ্যা)। চেষ্টা করা হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করার (যেমন— ঈশ্বর একটি শক্তি)। কসমিক রে, ইনফ্রারেড, আলট্রাভায়োলেট প্রভৃতি বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করে রেইকি, বাস্তুর মতো কুসংস্কার বিজ্ঞানের মোড়কে বিক্রি হচ্ছে।

যুক্তিবাদীরা বরাবরই জ্যোতিষ ও অলৌকিকত্বের অসারতা প্রমাণ করেছে। নতুন কোনো বিষয় (যেমন— বিশ্বরূপের মেমারি টেকনিক) উঠে এলে, তা খতিয়ে দেখে তবেই গ্রহণ বা বর্জন করেছে। যুক্তিবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদের অবস্থান দুই মেরুতে। যুক্তি ও বিজ্ঞানের কথা বলে কিছুদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়, সবসময় নয়। এইক্ষেত্রে সেই বিখ্যাত উক্তিটি উল্লেখ করা যায়— "One can fool—some people for all days, all people for some days, but not all people for all days."।

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে কুসংস্কারের ব্যাপারিদের মুখে যুক্তির কথা বোধহয় কোথাওনা কোথাও যুক্তিবাদ-এরই জয়। কারণ তাদের নিজেদের প্রচার বা প্রসার ঘটাতে হচ্ছে সেই যুক্তিবাদেরই হাত ধরে।

জ্যোতিষ, বাস্তু বা এই ধরনের বিষয়গুলিতে প্রচারমাধ্যমের দেওয়া তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলি সত্যিই কতটা যুক্তি-বিজ্ঞান সম্মত, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগলে সরাসরি পত্রিকা দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন।

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু প্রতিদিন গড়ে চার জন

'এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস' দিল্লির একটি মানবাধিকার সংস্থা। তার পরিসংখ্যান বলছে ভারতে গত পাঁচ বছরে সরকারি হেফাজতে ৭৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন চারজন। অধিকাংশই মারধোর অত্যাচারের ফল। সরকার সবসময়েই চেষ্টা করেছে মৃত্যুর কারণ হিসাবে অসুস্থতা, পালানোর চেষ্টা, আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনাকে দায়ী করতে। সংস্থাটির ডিরেক্টর আরও বলছেন মৃত্যুর জন্যে দায়ী সরকারি অফিসারদের বিচার এত দীর্ঘস্থায়ী হয়—কখনও ২৫-৩০ বছরও চলে—যে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এইসব দোষী অফিসারদের অব্যহতি পাইয়ে দেবার একটা সরকারি কায়দা। এর ফলে হেফাজতে অত্যাচারের সংস্কৃতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা হয় লাগামছাড়া। এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইট্স সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের সনদকে কার্যকরী করে এই ধরনের অত্যাচারকে একটা সুনির্দিষ্ট ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

প্রবন্ধ

নৈরাশ্য একটি সামাজিক ব্যাধি

মানসী মল্লিক

এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব।
সেই চাঁদের পাহাড়, মাথায় যাহার
রামধনু রং হয়, দেখতে পাব...

মনে আছে গানটি? 'হীরে-মানিক' সিনেমার। শৈশবেই মা-বাবাকে হারিয়ে, তাদের ফিরে পাওয়ার কেমন আপ্রাণ চেষ্টা। না, আমি কোন সিনেমার রিভিউ লিখছি না। 'আশা'—করতে শেখা ও শেখানো। আশাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়।

যুক্তিবাদী আন্দোলনে সামিল আমরা একদল মানুষ। আমরা কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখিনা। তাকে বাস্তবায়িত করার একটা নিখুঁত প্রয়াস সবসময় চলছে। আমরা বিশ্বাস করি—

সমাজটা একদিন ভাল ছিল। কিছু অসৎ লোক, তাদের দুর্নীতি সমাজটাকে পচিয়ে দিয়েছে, পিছিয়ে দিয়েছে। একদিনে তা হয়নি। একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গেছে অবক্ষয়ের দিকে। ঠিক উল্টো ভাবে একটু একটু করে আমরা সমাজটাকে ভাল করতে চেষ্টা করছি। ভাল হবে, সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে আশায় আছি। কিন্তু গন্ডগোলের শুরু ঘর থেকে। প্রায়ই শুনতে হয় একটা কথা "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিস"। আসলে আমার, আপনার, প্রত্যেকেরই এই অভিজ্ঞতা কম-বেশি। প্রত্যেকের পরিবার মধ্যবিত্ত মানসিকতার শিকার। আমাদের পরিবারে সবাই আছেন—মা, বাবা, ভাই, বোন, বর, শ্বশুর, শাশুড়ি, ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চলতে চায়। এরা সুবিধাভোগী, দুর্বল মনের মানুষ।

যেদিকে ঝোল পায়
সেদিকেই ভাত মাখে।

এরাই যখন বিপদে পড়ে বা কোনও সমস্যায় জড়ায়, তখন ওদের অসহায় চোখ দুটো 'মোষ তাড়ানো' মানুষগুলোকেই ভরসা করে।

'নগরে লেগেছে আগুন। আমার কি?'

এক সন্ধেবেলার তর্ক। সূর্যের আলো নিভতে শুরু। সাইডিং-এর চিত্রটা যায়

বদলে। অবাধে হয়ে চলেছে চোলাই মদের কারবার। পুলিশ-প্রশাসনের অজানা কিছু নয়। নিয়ম করে মাঝে মাঝে ঠেক ভাঙার অভিযান। ওরা সবাই গিয়ে ঘরে খায়। স্থানীয় মানুষ কি বলে? কোনও অভিযোগ বা প্রতিবাদ! না। নিশ্চুপ অথবা দায়িত্বহীন উত্তর, "কি হবে বলে, কিচ্ছু হবে না। খারাপ-নিম্নমানের লোক ছাড়া তো কেউ যায় না।" অতএব বলার কিছু নেই। এত নিশ্চিত এই ব্যাপারে। কিন্তু কাল যখন তোমার ছেলে একটু মজা নেওয়ার অজুহাতে, বাংলা খেয়ে এসে বলবে "দেখ আমি খাচ্ছি মামি" তখন...

ঘর থেকে বেরিয়ে পাড়ার মোড় কি চায়ের দোকান। যেখানেই যান, দেখবেন নিরাশাবাদী একদল মানুষের ভীড়। আপনার চেষ্টা, প্রয়োগ বা আপনার প্রতিবাদে জল ঢেলে দিয়ে একরকম শান্তি পান। অথবা দায়িত্ব এড়িয়ে শুধু গা বাঁচিয়ে চলেন। এরা শুধু মুখেই বলবেন "কি হবে আর, সমাজটাতো শেষ হয়েই গেছে। দুর্নীতির বিষ ফোপরা করে দিয়েছে প্রতিটি স্তর। এরা সব জানে সব বোঝে। গত ৩০ বছরের সিপিএম-এর রাজত্বে যে হিংসা, খুন, ধর্ষণ, লুঠ সব ঘটনা জানা এদের। সরকার পাল্টাতে হবে তাও বোঝে এরা, কিন্তু তবু এদের নিরাশা এদের কুরে কুরে খাচ্ছে। আর তার প্রভাব ক্যান্সারের মত ছড়ায় অন্য প্রতিবাদী মানুষগুলোর ওপর। তারা নিজেরা ভাবে ও অন্যকে ভাবায়—সিপিএম গেলে কে আসবে? সেও দুর্নীতি করবে না তার কি গ্যারান্টি? অতএব তারাই থাক। অথবা হতাশা, তাদের সরাবে কি করে? তাদের প্রশ্ন, প্রশ্নই থেকে যায়। তারা ইতিহাস পড়েছে মুখস্থ করে। মাথায় রাখেনি। ২৫০ বছরের পরাধীন ভারতবর্ষের সেই ইতিহাস। একটা অন্য দেশ থেকে এসে ভারতকে দখল করল ইংরেজ। তাদের মেধা-বুদ্ধি-অর্থবল-অস্ত্র সবকিছুই অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল সিপিএমের থেকে। সুতরাং একদিনের লড়াইয়ে কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেতা যায়নি। কিন্তু জিতেছে। ভারতবাসীই জিতেছে। ইংরেজ ভারত ছেড়েছে। আজ আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। এই স্বাধীনতার লড়াইয়ে কত প্রাণ, কত রক্ত ঝরেছে। তাহলে সেই বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে নিরাশাবাদীরা কি বলতে পারবেন, 'ওরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছিল'? নাকি নিরাশার মোম জ্বেলে বসে থাকলেই দেশটা স্বাধীন হয়ে যেত?

আরও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ 'নেপাল'। ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান। ক্ষোভ-রাগ জমতে থাকা নেপালের সাধারণ নাগরিক কিন্তু এতকাল চুপ করে বসে থাকেনি। ভেতরে ভেতরে চলছিল কিছু প্রক্রিয়া। মাত্র পাঁচ বছরে বদলে গেল একটা গোটা দেশের ইতিহাস। দীর্ঘ রাজতন্ত্রের পতন। নেপাল আজ গণতান্ত্রিক দেশ। অতএব 'সময়' একটা ফ্যাক্টর। অর্থাৎ সবকিছুর সফল হবার পেছনে থাকে একটা প্রক্রিয়া ও কিছুটা সময়। আমার যদি আজ হাত কাটে, মলম লাগালে কাল ব্যথা সেরে যাবে। কিন্তু হাত যদি ভাঙে, তবে আশা করতে পারিনা কাল সেরে যাবে।

১ মাস সময় লাগতে পারে। সুতরাং আমায় বুঝতে হবে সমাজের ক্ষতটা কত! তাকে সারিয়ে তুলতে সময় দিতে হবে। সময়ের আগে নিরাশা চেপে বসলে ব্যাধি বাড়বে।

নেতিবাচক চিন্তা কোনও দিনই কোনও কাজ সফল করেনি। পৃথিবী যত বড় বড় লড়াই জিতেছে সবই ইতিবাচক চিন্তার ফসল।

● বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজিতে। তার ইচ্ছা আর চেষ্টাই তাকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

● দু-পা কাটা সাতারু মাসুদুর রহমান। তাঁর আশাবাদী মন তার সাফল্যের মূল অনুঘটক।

● প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। দুর্গম পাহাড়। সবকিছুকে জয় করে এভারেস্ট শীর্ষে; এও এক প্রবল আশাবাদী দৃষ্টান্ত।

এমনি খুঁজলে কত পাওয়া যাবে, যারা কোনও দিন নিরাশায় ভোগেননি, বা নিরাশা এদের ছুঁতেও পারেনি। অতএব নিরাশাবাদীদের থেকে দূরে থাকুন, অথবা চেষ্টা করুন সেই রোগ থেকে তাদের সুস্থ করে তুলতে।

ভোগবাদ আর ভাববাদের সাথে নৈরাশ্য একটি জায়গা করে নিয়েছে সমাজের অবক্ষয়ে। এটি শুধু সামাজিক ব্যাধি নয়। একটা সমাজবিরোধী চিন্তা। অতএব যারাই আপনাকে হতাশায় ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করবে তাদের ঘৃণা করতে শিখুন। অবজ্ঞা করুন। আপনি চলুন আশার আলো নিয়ে, আলোর দিশারী হয়ে, আলোর পথযাত্রী হয়ে।

অভিনন্দন

৮ জুলাই, ২০০৮ : আসামের গোয়ালপাড়ায় 'মেমারিম্যান' বিশ্বরূপ অনুষ্ঠান করতে গেলে সেখানে যুক্তিবাদী সমিতির শাখা সম্পাদক খুরশিদ আলম ও তার সঙ্গীরা তাকে কুড়িটি শব্দ উচ্চারণ না করে মুখস্থ করতে বলে। যথারীতি বিশ্বরূপ আবারও ব্যর্থ হয়। বুজরুকি ফাঁস হয়ে যেতেই মেমারিম্যানের গুন্ডারা খুরশিদদের মারধোর শুরু করে। পুলিশ সমিতির অভিযোগ গ্রহণ করে মেমারিম্যানের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। বিশ্বরূপ বর্তমানে পলাতক।

১৩ জুলাই, ২০০৮ : বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরির বার্ষিক সাধারণ সভায় যুক্তিবাদী সমিতির দুই সদস্য মনীশ ও সপ্তর্ষি এই পুরনো ও জনপ্রিয় পাঠাগারটিতে অভেদানন্দ, নিগূঢ়ানন্দ ইত্যাদিদের অবৈজ্ঞানিক ও বিভ্রান্তিকর বইপত্র রাখার বিরুদ্ধে লিখিত দরখাস্ত পেশ করে। তারা ক্ষতিকর অপব্যাখ্যা সম্বলিত বইয়ের একটি তালিকা জমা দেবে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত।

যৌন প্রতারণা ও এক স্বামীজী

সন্তোষ শর্মা

যুক্তিবাদী সমিতি বিভিন্ন ভন্ড-প্রতারক জ্যোতিষ-তান্ত্রিক-বাবাজীর ভন্ডামি ফাঁস করছে এবং এইসব ভন্ডদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য রাখছে। বর্তমানে কয়েকটি প্রচার মাধ্যমও এইসব প্রতারকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমে আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির কথা তুলে ধরা হচ্ছে।

এক স্বামীজীর প্রতারণার বিরুদ্ধে ইন্টারপোল থেকে অভিযান চালান হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ মে ২০০৮ শনিবার 'হেডলাইনস টুডে' চ্যানেল-এর তরফ থেকে যুক্তিবাদী সমিতিকে আমন্ত্রণপত্র পাঠান হয়। অনুষ্ঠানটির নাম 'Sex Swindle and a Swami'। এই 'লাইভ' অনুষ্ঠানে যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি সুমিত্রা পদ্মনাভন অংশগ্রহণ করেন।

'হেডলাইস টুডে' থেকে যুক্তিবাদী সমিতিকে জানান হয়েছিল যে 'গডম্যান' কান্ডকারখানা সম্পর্কে যুক্তিবাদীরা কি বলেন তা বলার জন্য।

রাত ৮টা থেকে ৮·৩০ পর্যন্ত 'লাইভ' অনুষ্ঠানে সুমিত্রাদি যেসব যুক্তি দিয়েছিলেন তা এখানে তুলে দিলাম, যাতে যারা অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেননি তারা বুঝতে পারবেন অনুষ্ঠানটির মূল সুর।

অনুষ্ঠানটির শুরুতেই একের পর এক বাবাজীর সম্পর্কে দেখান হচ্ছিল। এইসব বাবাজীরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অবতার, দূত ইত্যাদি বলে সাধারণ নাগরিকদের কিভাবে বোকা বানিয়ে ঠকাচ্ছে এবং কোন্-কোন্ বাবাজী কি কি ধরনের অপরাধ-এর সঙ্গে জড়িত।

আজকের অনুষ্ঠানটি যে স্বামীজীকে কেন্দ্র করে তাঁর আগের নাম ছিল সন্তোষ মাধবন। সে এক দুবাই-এর এন. আর. আই.-এর কাছ থেকে ৪৫ লাখ ডলার ঠকিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করেছিল। সে এখন কেরলের প্রতিষ্ঠিত এক গুরুজী। এই লোক ঠকানোর ব্যবসা করতে করতে বর্তমানে চৈতন্য অমৃতানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক প্রতারকরাই নিজের নাম-ঠিকানা পাল্টে ফেলেন যাতে লোকজন তাকে চিনতে না পারেন। কিন্তু দুবাই-এর এন. আর. আই. স্বামীজীর পিছু ছাড়েননি এবং শেষপর্যন্ত 'ইন্টারপোল'-এর দৌলতে স্বামীজীকে

পাকড়াও করা হয়েছে। বর্তমানে স্বামীজী প্রতারণা ও যৌন উৎশৃঙ্খলতার মামলায় ফেঁসেছেন।

স্বামীজীর বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে স্বামীজীর আশ্রম থেকে হেরোইন, গাঁজা, ব্লু-ফিল্ম-এর সি.ডি. পাওয়া গেছে। এইসব সি.ডি. স্বামীজীর আশ্রমে তৈরি করে বাইরে বিক্রি করা হয়। এইসব ব্লু-ফিল্মে দেশী-বিদেশী মেয়েদেরকে দেখা গেছে। সোজা কথায় স্বামীজী ধর্মসেবার নামে আশ্রমে মধুচক্রের ব্যবসা ভালোমতন চালাচ্ছিলেন। যেখানে এই ধরনের মধুচক্রের ব্যবসা চলে সেখানে রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ অফিসারের আনাগোনা হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং স্বামীজীর সঙ্গে নেতা, পুলিশ, প্রশাসনের কি রকম গাঁটছড়া বাঁধা রয়েছে তা অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তুলে ধরেন।

স্বামী চৈতন্য ছাড়াও ওশো (রজনীশ), সাঁইবাবা, চন্দ্রস্বামী, মহেশ যোগী, ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী-দের বিরুদ্ধে কি কি ধরনের অভিযোগ আছে তা দেখানো হল হেডলাইন টুডে অনুষ্ঠানে।

ওশো (রজনীশ)

পৃথিবী তোলপাড় করা এক বাবাজী হলেন ওশো। ওশো-কে ঘিরে সব-সময় দেশী-বিদেশী সুন্দরীরা থাকতেন। ওশোর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ-কর্ম ও মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগ আছে।

চন্দ্রস্বামী

ভারতের নামকরা যোগী-তান্ত্রিক। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমা রাও-এর উপদেষ্টা ছিলেন।

লন্ডন-এর এক ব্যবসায়িকে নিজের ফাঁদে ফেলে এক লাখ ডলার ঠকিয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত এই প্রতারণার জন্য জেল খেটেছেন। এখনও চন্দ্রস্বামীর বিরুদ্ধে FERA আইনে তদন্ত চলছে এবং তাঁকে ভারতের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ ওনার কাছ থেকে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গেছে।

মহেশ যোগী

জ্যোতিষচর্চা ও যে কোনও সমস্যার সমাধানের নাম করে লোক ঠকাতেন। লোক ঠকানোর ব্যবসায় ভালো টাকা করে নেদারল্যান্ডে আশ্রম খোলেন এবং শেষ জীবন সেখানেই কাটিয়েছেন। প্রাচীন যোগগ্রন্থগুলোতে বলা আছে 'খেচরী মুদ্রা যোগসাধনার পারদর্শী হলে তার মৃত্যু নেই। মহেশ যোগীর মৃত্যুর ফলে এটা প্রমাণিত হল যে 'খেচরী মুদ্রা' দিয়ে লোককে ঠকানো গেলেও অমর হওয়া যায় না।

ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

ধর্ম-ব্যবসার নামে প্রতারণা করে ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী এক বিশাল আশ্রম তৈরি করেছিলেন। কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর আশ্রমটিকে 'সিজ' করা হয়। তিনি নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছিলেন।

এরপর 'হেডলাইনস টুডে'-এর স্টুডিওতে যুক্তিবাদী মতামত শোনার জন্যে ডাকা হল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জি.এস. সুমিত্রা পদ্মনাভনকে। তিনি কি উত্তর দিয়েছেলেন তা দেখবো—

প্রশ্ন : এই ধরনের প্রতারক বাবাজীরা প্রতারণা কীভাবে শুরু করে এবং ব্যবসা বিস্তার করে?

সুমিত্রাদি : এইসব প্রতারকরা প্রথমে একাই শুরু করেন। প্রথমদিকে নিজেদের এলাকার গরিব মানুষদের ভুলিয়ে প্রতারণার ব্যবসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ-প্রশাসনের মদতে ব্যবসা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলেন। এইভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ ও বাবাজীর ব্যবসা একটি সিন্ডিকেটে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কোনও রকমের সমস্যা দেখা দিলে একে অপরকে সাহায্য করেন। কারণ, রাজনৈতিক মন্ত্রী, নেতা, আই. এস., আই. পি. এস.-দের তো টাকার অভাব নেই এবং অঢেল টাকা ওড়াতে এইসব বাবাজীদের আশ্রমে আনাগোনা করেন। এই অবস্থায় কোনও রকমের সমস্যার সৃষ্টি হলে বাবাজী ও পুলিশ-প্রশাসন একে অপরকে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : ভারতীয় জনগণ এত সহজে বোকা বনেন কেন?

সুমিত্রাদি : আজও ভারতের বেশিরভাগ লোক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। একইসঙ্গে এইসব তথাকথিত বাবাজী-মাতাজীকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে বিশ্বাস করেন যে এইসব বাবাজীরাও ঈশ্বরের মত যে কোনও সমস্যার সমাধান করে দেবেন। ফলে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা যেভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেন, একইভাবে তথাকথিত 'গডম্যান'-দের হাতে নিজেকে সঁপে দেন। যতদিন 'গড'-এ বিশ্বাস থাকবে—গডম্যানরাও তৈরি হতে থাকবে।

কিন্তু আমার একটি কথায় আপত্তি আছে, 'গডম্যান' (অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি!) বলে কিছু হতে পারে না। 'গুডম্যান' (ভালো মানুষ) হতে পারেন। এখানে 'গড' (ঈশ্বর) আসছে কোথা থেকে। আমি তো আজ অবধি ঈশ্বরের কোনও একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাই পাইনি। 'গড' কথাটা তাই আমার কাছে কোনও অর্থই বহন করে না। আমরা আমাদের সমাজ থেকে ভালো মানুষকে খুঁজে নেবো যারা সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করেন। কিন্তু যারা বলেন, আমি তোমাদের যে কোনও সমস্যার সমাধান করে দেবো অর্থের বিনিময়ে, তারা স্রেফ ব্যবসা করছেন। তাদেরকে

'গডম্যান' বলবো কেন? দেখছেন তো রামদেবের আশ্রমে সদস্য হতে ন্যূনতম ১১০০০ টাকা দিয়ে শুরু।

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনার কোনও মানসিক বা আত্মিক শান্তির জন্য কি ঈশ্বরকে দরকার হয় না?

সুমিত্রাদি : না, আমি ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন দেখিনা। মন খারাপ হলে কোনও ভাল বন্ধুর কাছে যাবো। আরও জটিল সমস্যা হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা কাউন্সেলিং এর জন্য কারুর কাছে যাবো। তাছাড়া আমাদের সভ্যতার ইতিহাস দেখুন—এটা তো মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসা দিয়ে একটা সুন্দর সমাজ গড়ার চেষ্টা। এর মধ্যে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?

প্রশ্ন : সত্যিকারের যোগীপুরুষ থেকে এদেরকে কিভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করবেন? রামদেব সম্পর্কে কী বলবেন?

সুমিত্রাদি : আমরা কি দেখে আলাদা করবো? জামাকাপড়, কথাবার্তা নাকি সমস্যার সমাধান দেখে? রামদেবের ব্যায়াম-এর বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু উনি বলছেন, নখে-নখ ঘষলে টাকে চুল গজাবে, 'খেচরী মুদ্রা' যোগসিদ্ধ হলে অমর হওয়া যায়। 'হস্ত মুদ্রা' করে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এইসব অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বললে তো আর তার উপরে ভরসা করা যায় না।

দেখছিলাম, সাঁইবাবা, যিনি এখন ৮০ বছরের হয়ে গেছেন, রোগে জর্জরিত। তিনি তো নিজেকে ঈশ্বরের অবতার, সর্বরোগের সমাধানকারী বলেন, তার আশ্রমে দু'দিন আগে বোমাতঙ্ক হয়েছিল। পুলিশ এসেছিল, কেন? তিনি ঈশ্বর, তার আবার দেহরক্ষী লাগে কেন?

'হেডলাইনস টুডে' চ্যানেলে এত সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য সুমিত্রাদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান হয়।

১৮.০৫.২০০৮, রবিবার দুপুর ১·৩০-২ টা পর্যন্ত এবং ৪ থেকে ৪·৩০ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার করা হয়।

www.tuitionindia.com থেকে e-mail করে অভিনন্দন জানিয়েছে Headlines Todayতে GODMEN সম্পর্কে আমাদের মতামতকে। তার সঙ্গে একটা খবর দিয়েছে—IRDA নামক একটি **সরকারী সংস্থা** (হায়দ্রাবাদ) **"স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া"** নামক সত্য সাঁইবাবার অনুষ্ঠানের জন্য **দূরদর্শনকে বছরে দু'কোটি টাকা** করে দেয়। এতদিন পর্যন্ত দশ কোটির উপর টাকা খরচা করেছে **IRDA** সাঁইবাবার জন্যে।

www.tuitionindia.com ওয়েবসাইটটি সবাইকে দেখতে অনুরোধ করছি। 'হেডলাইনস্ টুডে'-র পুরো অনুষ্ঠানটির সি.ডি. পাওয়া যাচ্ছে।

৬ জুন, ২০০৮

মাননীয় সম্পাদক,

আপনাদের রবীন্দ্র সংখ্যা ২০০৮ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনাদের সাংগঠনিক খবর সত্যিই অবাক করেছে। অসাধারণ তথ্যপূর্ণ লাগলো তিব্বতের ইতিহাস, যা আগে কখনও পড়িনি। আর 'পৃথক রাজ্যের দাবী' বিষয়ে শ্রী প্রবীর ঘোষের ধারালো যুক্তিপূর্ণ শেষাংশ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে একটি বিস্ফোরণ।

কিন্তু পলাশ ভট্টাচার্যের আইন কলামে সংরক্ষণ বিষয়ে লেখাটি হতাশ করেছে। পলাশবাবু একটু খতিয়ে দেখলে দেখতে পেতেন সংরক্ষণ বিষয়ে যা হয়েছে তা মূলতঃ 'আই-ওয়াশ'। যা হয়েছে তার মধ্যে অনেক ফাঁক ফোকর আছে।

১) প্রথমত এই কোটা ধাপে ধাপে কার্যকরী হতে আরও তিন বছর লাগবে।

২) বেসরকারী কলেজগুলি এর আওতায় পড়বে না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট-এ বেসরকারী কলেজই বেশি।

৩) যেগুলো আওতায় আসবে সেখানে ৫৪% সিট বাড়িয়ে তবেই সংরক্ষণ চালু করা যাবে। সেটা খুব সহজ কথা নয়। অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ।

৪) সচ্ছল ও.বি.সি.-দের, যাদের মাসিক পারিবারিক আয় ৩০,০০ বা ওইরকম কিছু বা তার বেশি তারা এর আওতায় পড়বে না। তাছাড়া পূর্ববর্তী প্রজন্ম যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, CA ইত্যাদি হয়, অর্থাৎ কোটায় বা কোটা ছাড়াই শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে, তবে তারা ও.বি.সি. হলেও এই সুযোগ পাবে না।

৫) পাঁচজন প্রাক্তন জাজের একটি বেঞ্চ MP বা MLA-দের সন্তানদেরও সংরক্ষণের আওতার বাইরে রাখার সুপারিশ করেছেন।

৬) শুধুমাত্র স্নাতক স্তরেই সংরক্ষণ প্রযোজ্য। অর্থাৎ MA, MSC অথবা MD ইত্যাদিতে কোনও সংরক্ষণ থাকবে না।

এতগুলি 'যদি' এবং 'তবে' থাকার দরুণ মনে হয় আপাত দৃষ্টিতে যতই মনে হোক ইউ.পি.এ. সরকার নির্বাচনের আগে শেষ চালটা সংরক্ষণের পক্ষে দিল, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। বরং সংরক্ষণকে চিরকালের মত ঠান্ডা ঘরে পাঠাবারই ব্যবস্থা পাকা হল।

ইতি—
নীতা মন্ডল
কাটাবেড়া, বাঁকুড়া

আমরা
যুক্তিবাদী
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

স্বাধীনতা সংখ্যা | আগস্ট ২০০৮ | দাম : ১৫ টাকা

"এখানে উৎসব হচ্ছে, নাচ হচ্ছে,—বন্দেমাতরম
খানাপিনা, রঙতামাশা, দেখতে দেখতে উড়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ বছর
পঞ্চাশ বছর ধরে তোমাকে সেলাম করছি হুজুর-এ-আজম
তাড়িয়ে দিও না মাইরি, বোলো না ধমকি দিয়ে—'লজ্জা নেই তোর'?
আজকে একটু দেখতে দাও, লজ্জা ঘেন্না ভুলে গিয়ে নাচছে কত টাকা
কোমরে কি ঢেউ মাইরি, কলিজা ফাটিয়ে নাচছে সিল্কের পতাকা।"

—শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

গোর্খাল্যান্ডের দাবী : কী ও কেন
রাষ্ট্রীয় 'আইনী' সন্ত্রাস
নেতা হতে হলে
মানসিক চাপ কমাতে
নৈরাশ্য একটি সামাজিক ব্যাধি
ব্যতিক্রমী বরুণ সেনগুপ্ত

যুক্তিবাদী লেখা পাঠান

- ✶ ধর্ম থেকে রাজনীতি, সিনেমা, নাটক, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান—যে কোনও সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে লেখা হতে পারে।
- ✶ পৃষ্ঠার একদিকে মার্জিন রেখে, প্রতি লাইনের পরে যথেষ্ট ফাঁক রেখে ফুলস্কেপ কাগজে লিখবেন।
- ✶ যথাসম্ভব পরিষ্কার হাতের লেখায়, সঠিক বানানে লিখবেন।
- ✶ অবশ্যই মূল লেখাটি পাঠাবেন, নিজের কাছে কপি রাখবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- ✶ তথ্যসূত্র দিলে শুধু পত্রিকার নাম দেবেন না, তার সঙ্গে তারিখ দেবেন।
- ✶ লেখার শেষে নাম-সই সহ ঠিকানা লিখতে হবে।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ **প্রবীর ঘোষ**-এর

মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা ১০০্

মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের ডিকশনারী। সত্যিই কি তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী? নাকি কৌশলে বোকা বানাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে? আমাদের পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান? রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং... ১২৫্

'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস'-এ এনেছেন 'সন্ত্রাস'-এর নানা সংজ্ঞা। কী বলছে উইকিপিডিয়া, রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ? 'নেপাল' প্রবন্ধে এসেছে মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, তাদের গেরিলাযুদ্ধের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি। বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের নানা জ্বলন্ত সমস্যা।

প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

"অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে, অলীক বিশ্বাসের নামে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সে একা একটি সৈন্যদল।...এই কাজে প্রবীরের প্রাথমিক প্রেরণা এবং মূল্যবান নেতৃত্ব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

— ডঃ পবিত্র সরকার।

অলৌকিক নয়, লৌকিক
(১ম) ১৬০্ (২য়) ১২৫্ (৩য়) ২০০্ (৪র্থ) ১২৫্ (৫ম) ১০০্

মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন ১২৫্

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920
Fax : 2219-2041 e-mail : deyspublishing@hotmail.com

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫
● e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com ●
website : www.prabirghosh.tk, www.thefreethinker.tk, www.juktibadi.tk
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত